শব্দের আড়াল

সমরেশ মজুমদার

If you want to download
a lot of ebook,
click the below link

Get More
Free
eBook

VISIT
WEBSITE

www.banglabooks.in

Click here

শব্দের আড়াল

সমরেশ মজুমদার

Scan & Edited By:

Suvom

শব্দের আড়াল

সমরেশ মজুমদার

শ্বেতপদ্ম প্রকাশন
বাংলাবাজার, ঢাকা।

শব্দের আড়াল

সমরেশ মজুমদার

প্রকাশক
শ্বেতপদ্ম প্রকাশন
টেকনিক কম্পিউটারর্স
গ্রাফিক্স সহযোগীতায়
তরুন
মুদ্রণ
ধানসিঁড়ি প্রিন্টার্স, ঢাকা।

মূল্য ঃ ৬০ টাকা।

শব্দের আড়াল

ঠিক সাড়ে পাঁচটায় নটবর গুহকে নিয়ে গড়িটা এসে দাঁড়ায় বাড়ির সামনে। গাড়িটা কেনা হয়েছিল ষাট সালে। কিনেছিলেন নটবরের শ্বশুরমশাই। এই গাড়িটাকে বিক্রি করার অধিকার নটবরের নেই। শ্বশুরমশাই মরার আগে যে সব নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন তার মধ্যে একটা হল সুখবিলাস পঙ্গু বা মরে না যাওয়া পর্যন্ত তাকে চাকরি থেকে ছাড়ানো যাবে না। সুখবিলাস এই গাড়ি চালায়। চাকরি হারাবার ভয়ে বৃদ্ধ সুখবিলাস গাড়িটাকে এমন সন্তানস্নেহে রেখেছে যে গত চল্লিশ বছরের রোদ ঝড়-জল এবং গর্ত গাড়ির কোনও ক্ষতি করতে পারেনি। সুখবিলাস ঈষৎ কুঁজো হয়েছে, চশমার শক্তি বেড়েছে কিন্তু গাড়ির ইঞ্জিন এখনও টগবগে ঘোড়ার মতো।

নটবরের বয়স এখন ছাপ্পান্ন। শরীর স্বাস্থ্য ভাল। চুলে পাক ধরেছে। এই বাড়ির জামাই হওয়ার আগে সে খুব গরিব মায়ের মেধাবী ছাত্র ছিল। অর্থাভাবে কলেজে পড়ার সময় যখন সে সর্ষেফুল দেখছিল তখন কাগজে একটি বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। বিজ্ঞাপনদাতা ঘোষণা করেছিলেন, স্কুল ফাইন্যালে যে সব ছাত্র তিন তিনটি বিষয়ে লেটার পেয়েছে তারা উজ্জল ভবিষ্যতের আশায় থাকলে সরাসরি দেখা করতে পারে। নটবরের তিনতিনটি লেটার ছিল কিন্তু সামনে কোনও উজ্জল প্রতিশ্রুতি ছিল না। তাই সে কাগজপত্র নিয়ে সময়ে হাজির হয়ে দেখল আরও আট জন তরুণ সেখানে জমায়েত হয়েছে।

যে ভদ্রলোক বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন তিনি প্রবীণ। গম্ভীর গলায় প্রথম প্রশ্ন করেছিলেন, 'মাছ কয় প্রকার হয়?'

নটবর জবাব দিয়েছিল, 'দুই প্রকার। এক প্রকার খাওয়া যায় অন্য প্রকার খাওয়া যায় না।'

'খাওয়া যায় না এমন মাছের নাম বলো।'

'জেলিফিস।'

'বাঙালদের প্রিয় কোন মাছ ঘটিরা খায় না?'

'বোয়াল।'

'ঘটিদের প্রিয় কোন মাছ যা সচরাচর বাঙালরা খায় না?'

'গুলে।'

ভদ্রলোক টেবিল চাপড়ালেন, 'গুড। বাবা মা আছেন?'

'বাবা গত হয়েছেন, মা আছেন।'

'গুড। তোমার দ্বারা হবে। হওয়তেই হবে। তুমি প্রথম, তুমিই শেষ। আমার কাউকে আর ইন্টারভিউ করার দরকার নেই।' শ্বশুরমশাই খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন, 'তোমার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল।'

বয়স হওয়ায় সুখবিলাস একটু শ্লথ হয়েছে। বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে নীচে নেমে এসে পেছনের দরজা খুলে দেওয়ার আগেই গুণধর ছুটে এসে ওই কর্মটি করে। যদিও এখন গুণধর ওপর মহলের ভৃত্য তবু নটবরকে দেখে সে নিজেকে সংবরণ করতে পারে না। গুণধর এখন পঞ্চাশের ওপাশে কিন্তু সে নিজের বয়েস উনপঞ্চাশ বলতেই ভালবাসে। ঈশ্বর যাদের দাবিয়ে রাখতে চায় তাদের মাথায় চাঁটা মারেন বলেই টাক পড়ে বলে তার ধারণা।

গাড়ি থেকে নেমে একবার ওপরের দিকে অলস চোখে তাকিয়ে নিয়ে নটবর জিজ্ঞাসা করে। 'কোন মাছ'?

গুণধর নাক টানে। নটবরের শরীর থেকে বেরিয়ে আসা পাঁচমিশেলি গন্ধগুলোকে আলাদা করার চেষ্টা করে প্রাণপণে। তখন তার চোখ বন্ধ, নাক বিস্ফারিত। তার তুলনায় নটবর অনেক চওড়া এবং দীর্ঘকায়। সারাদিন মাছের আড়তে থাকে বলে পরনে হ্যান্ডলুমের হাফশার্ট আর ধুতি। সেগুলো দিনে দিনেই ময়লা, গন্ধময়।

আজও গাড়ি থেকে নেমে রোজকার মতো নটবর জিজ্ঞাসা করল, 'কোন মাছ?'

গুনধর নাক টানল, 'গুরজালি।'

'কেন? ইলিশ নয় কেন?' নটবর চোখে ছোট করল।

'উহুঁ। ঠিক ইলিশ বলে মনে হচ্ছে না বড়বাবু।'

'সাবাস। তুই দেখছি মা জননীর পোষা বুলডগ। নে একটা টাকা।' পকেট থেকে গোলমুদ্রা বের করে গুনধরের হাতে দিয়ে নটবর নীচের মহলে ঢুকে পড়ল।

প্রথমেই বসার ঘর। অগোছালো। শ্বশুরমশাই-এর বাপের আমলে যে সব পেন্টিং কেনা হয়েছিল সেগুলো এখনও দেওয়ালে ঝুলছে। আহা, কি সব মেয়েমানুষ সে সময় জন্মেছিল! কী ফিগার, তাকানো বা বসার ভঙ্গি দেখলে আর একবার জন্মাতে বাসনা হয়। ঘরে ঢুকে ওদের দিকে একবার তাকানো নটবরের নিয়ম। তারপর গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কেউ এসেছে নাকি?'

কোনও জবাব এল না।

নটবর হুঙ্কার ছাড়ল, 'গুনধর। এ্যাই গু-ণ-ধ-র!'

গুণধর ছুটে এল দরজায়, 'আজ্ঞে!'

'তোর মা জননীকে খবর দে। মগের মুল্লুক পেয়েছে নাকি। দুদিন ধরে বলছি আমার কোনও কাজের লোক নেই, সে কানেই তুলছে না। সারাদিন খেটেখুটে আমি কি ভাগাড়ে বসে থাকব? না, খবর দিতে হবে না। আমিই যাব ওপরে!' নটবর দরজার দিকে এগোল।

গুণধর আঁতকে উঠল, 'আপনার পায়ে পড়ি বড়বাবু, ওপরে গেলে কুরুক্ষেত্র হয়ে যাবে। আমি এখনই মা জননীকে খবর দিচ্ছি!'

'হোক কুরুক্ষেত্র! আমি তো তাই চাই। ওর বাপ আমার পায়ে ধরে এনে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের লোভ দেখিয়েছিল! এই সেই ভবিষ্যৎ? সর, সরে যা, নইলে পেটে ক্যাঁক করে লাথি কসিয়ে দেব।' ছাদ ফাটিয়ে চিৎকার করল নটবর।

আর তখনই দরজার বাইরে সিঁড়ির নীচের ধাপ থেকে গলা ভেসে এল, 'গুণধর! এটা কি মাছের আড়ত না বস্তি বাড়ি!'

সঙ্গে সঙ্গে গুণধর সটকে গেল। তার বদলে দরজায় যিনি এসে দাঁড়ালেন তাঁর বাঁ হাত আঁচল তুলে নাক ঢেকেছে। মহিলা চল্লিশের ওপারে হলেও লাবন্যময়ী, গৌরবর্ণা, স্বাস্থ্যবতী। আভিজাত্য পোশাকে, ভঙ্গিতেও। তাঁর পেছনে ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে কালো গোলগাল যুবতী যার ঠোঁটে পানের রস অবিরত অবিরত প্রলেপ বুলিয়ে চলেছে। মা জননী আঁচল না সরিয়ে বললেন, 'কী উৎকট গন্ধ, অন্নপ্রাশনের ভাত বেরিয়ে আসে। 'একটু দূরে যাও, যাও, নইলে কথা বলতে পারব না।'

নটবর একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে বলল, 'এটা আমার এলাকা!'

'তাই বলে হেগেমুতে বসে থাকবে আর আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব ভেবেছ নাকি। সরো।'

নটবর তিনপা পিছিয়েই চিৎকার করল 'তোমার বাপ যে সব শর্ত দিয়েছিলেন তার সব মেনে চলেছি। তিনি গত হওয়ার পর তুমি যা চেয়েছ তা মান্য করেছি চুপচাপ। সকাল থেকে সন্ধে তোমার বাপ আমাকে মাছের আড়তে জুতে দিয়েছিল, আজও সেটা টেনে চলেছি। কিন্তু হোয়াই? আমার কোনও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কেউ দেখবে না? আমি তো কাউকে ডিস্টার্ব কেউ দেখবে না? আমি তো কাউকে ডিস্টার্ব করি না। তাহলে আমাকেই কাজের লোক খুঁজতে পাড়ায় বের হতে হবে? বলে দাও, তাই বেরুচ্ছি!'

'হাতের মোয়া? হাত ঘুরালেই এনে দেব? আজকাল চাইলেই কাজের লোক পাওয়া যায়? বুড়ি হলে চলবে না, অলস হয়। বাচ্চা হলে চলবে না, কাজ জানে না। কুমোরটুলিতে অর্ডার দেব?'

'বেশ। বলে দাও, পারবে না।'

'এতকাল তো এনে দিয়েছি! চার চারটে কাজের লোক গত কুড়ি বছরে এই একতলায় কাজ করেনি? দুদিন কাজ করে তারা বলত বড়বাবু দেবতুল্য লোক আর মা জননী খান্ডারনি। কই, রাখতে পেরেছ তাদের? মাইনে বাড়িয়ে বাড়িয়ে এমন লোভ দেখালে যে নিজেই তাদের তাড়ালে।'

'এসব কথা শুনলে সমস্যার সমাধান হবে না। আই ওয়ান্ট সমাধান।'

'খবরদার। আমার সঙ্গে ইংরেজি বলবে না!'

'তাই নাকি? তোমার ছেলে তো ইংরেজিতে অনার্স! ইংরেজি বই মুখে নিয়ে বসে থাকে। তার বেলা?'

'থাকবেই তো। কার নাতি তা দেখতে হবে না? কিন্তু সে আমার সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলার সাহস পায় না। থাকগে, এই বাড়িতে আমি অশান্তি চাই না। যদ্দিন লোক না পাওয়া যাচ্ছে তদ্দিন না হয় এলোকেশী দু'বেলা নীচে নেমে কাজ করে দিয়ে যাবে।' মা জননী ঘুরে দাঁড়াতেই একটি আর্তচিৎকার শোনা গেল। এলোকেশী তাঁর পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ল, 'ও মা জননী, আমি মরে যাব। আমি সহ্য করতে পারব না! এতবড় শাস্তি আমাকে দেবেন না। মা ম্যাগো!'

'চুপ। ধ্যাস্টামী করবি না। দু দিন কাজ করলে মরে যাবি?

'ওসব গন্ধ আমি কী করে সইব?'

'সইতে না পারলে দূর হও। এই আমার হুকুম।' মা জননী নাক থেকে আঁচল না সরিয়ে দ্রুত দোতলায় সিঁড়ির পথ ধরলেন। দৃশ্যটা চুপচাপ দেখছিল নটবর। মা জননী চলে যাওয়ার পর এলোকেশী এক পিঠ খোলা চুল নিয়ে মাটিতে বসে হাঁপাচ্ছে। নটবর চাপা গলায় বলল, 'আমার চানের জল রেডি কর। চান করে আমি অহ্নিকে বসব। জল রেডি করে আহ্নিকের ব্যবস্থা করবি। যা ওঠ। একটা কথা দু'বার বলা পছন্দ করি না আমি।'

আঁচল মুখে চেপে এলোকেশী তার স্ফীত শরীর নিয়ে কোনও রকমে উঠে দাঁড়াল। তাই দেখে নটবর হাঁ, 'এ কি? তুই কি এ-বাড়ির গিন্নি? আঁচল সরা, শিগ্‌গির আঁচল সরা। হ্যাঁ। কী যেন নাম?'

'এলোকেশী!'

স্নান শেষ করে সিল্কের পাঞ্জাবি আর লুঙ্গি পরে বাবু হয়ে বসল নটবর। তার সামনে দিশি মদের বোতল, চাঁট। চোখ বন্ধ করে প্রথম ঢোঁক গিলে লাল সুতোর বিড়ি ধরাল, এ দুটো তার বিলাস। বিলিতি মদ বা সিগারেটে তার একদম আসক্তি নেই। দিশি মদের সঙ্গে বিড়ির টান এক অপূর্ব অনুভূতি তার শরীরে ছড়িয়ে দেয়।

'কী যেন নাম? এলাকেশী। এলোকেশী?'

বাইরের ঘর থেকে সারা এল, 'আজ্ঞে!'

'এ্যাই তুই কি আমাকে ভাসুর ভাবছিস? আয়, এখানে এসে কথা বল। হ্যাঁ। বাবা এলোকেশী, তোর বর কোথায়?'

'তেরোয় বিয়ে হয়েছিল, পনেরোয় গলায় দড়ি দিয়েছিল।' দরজার পাশে এসে দাঁড়াল এলোকেশী, 'মুখটা মনেই পড়ে না।'

'আহারে তোর কী দুঃখ!'

'কোথায়?'

'এ্যাঁ? দুঃখ নেই?'

'নাতো!'

'অ। দ্বিতীয়বার চুমুক দিল নটবর, 'তাহলে কারও সঙ্গে রসের কারবার আছে। মা জননী জানে?'

'না বড়বাবু, আমার ওসব কারবার নেই!' মাথা নাড়ল এলোকেশী।

'ভাল। খুব ভাল। এতকাল ওপরে ছিলি, কী করতিস?'

'খোকাবাবু তো পারে না, মানে অভ্যেস নেই, তাই গুছিয়ে দিতে হয়।'

'নেকু! এখন থেকে আমার সবকিছু গুছিয়ে দিবি। বেয়াদপি আমি সহ্য করব না। আর হ্যাঁ, এখানকার কথা ওপরে গিয়ে লাগানো চলবে না। এখন তুই নীচের লোক। গন্ধ লাগছে?'

এলোকেশী সবেগে মাথা নেড়ে না বলল।

'গুড। কে ওখানে? কে?'

ওপাশের ঘর থেকে স্বর ভেসে এল, 'আজ্ঞে, আমি।'

'আমি? ব্যাটা ওখানে দাঁড়িয়ে আড়ি পেতেছিস? এখানে কি লীলা হচ্ছে যে নাটক দেখছিস? কী চাই?'

'আপনার জলখাবার!'

'এলোকেশীকে দিয়ে যা।'

'এলোকেশী সদর্পে পাশের ঘরে যায়।' নটবর নীচু স্বরে গুনগুন শুরু করল, 'এলোকেশীর, সর্বনাশী, সর্বনাশ ভালবাসী!'

পরের দিন মেজাজটা ভাল ছিল। মাছের আমদানি ভাল থাকায় ব্যবসা চমৎকার হয়েছে। শ্বশুরমশাই নিয়ম করে গিয়েছিলেন যা লাভ হবে তার আশি ভাগ তাঁর কন্যার নামে ব্যাঙ্কে রাখতে হবে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি কখনও। যে কুড়ি ভাগ নটবরের নামে জমা পড়ে তার কিছুই খরচ হয় না। খরচ বলতে মদ আর বিড়ির দাম ছাড়া সুখবিলাসের মাইনে, গাড়ির খরচ আর কাজের লোকের দায়িত্ব। নটবরের মাঝে মাঝে মনে হয় কোথাও বেড়িয়ে এলে ভাল হয়। মা যতদিন জীবিত ছিল ততদিন তাঁর ভরণপোষনের দায়িত্ব তার ছিল, তাঁকে নিয়ে একবার বেড়াতেও গিয়েছিল। আর যাওয়া হয়নি কোথাও। ওই ওপরে যিনি আছেন তাকে নিয়ে তো নয়ই। মুশকিল হল এইআড়ত বন্ধ হয় না কোনওদিন। বাজারে যে মাছ বিক্রি হয় তা কিনতে লোকগুলো হামলে এসে পড়ে আড়তে। বন্ধ রাখলেই ব্যবসার বারোটা, নটবরের মাঝে মাঝে মনে হয় এই ব্যবসার দায়িত্ব তুলে দিতে শ্বশুরমশাই কেন তিন তিনটে লেটার পাওয়া ছেলের খোঁজ করে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন? এ কাজ তো বুদ্ধিমান যে কেউ করতে পারে।

আজ গাড়ি থেকে নামতেই গুণধর ছুটে এল, নাক টানল কিন্তু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল।

নটবর অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কিরে? কোন মাছ?'

'আজ্ঞে, বুঝতে পারছি না।' মিনমিন করল গুণধর।

'কেন? আজ হঠাৎ ফেল করছিস কেন?'

হাতজোড় করে মাথা নাড়তে লাগল গুণধর, 'আমার নাক বন্ধ হয়ে গিয়েছে।' যেন কথা না বাড়াতেই গুণধর দ্রুত চোখের আড়ালে চলে গেল।

'মরণ!'

নটবর গলার স্বরে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল এলোকেশী দরজায় ঠেক দিয়ে দাঁড়িয়ে ঠোঁট বেঁকাচ্ছে। ভঙ্গিটা ভাল লাগল না তার। গম্ভীর মুখে ভেতরে ঢুকে গেল নটবর।

আহ্নিক করতে বসামাত্রই এলোকেশী খাবারের থালা সামনে এনে রাখল। ডিম সেদ্ধ, আলুমরিচ কাজুবাদাম। দিশি মদে চুমুক দিয়ে নটবর জিজ্ঞাসা করল, 'আজ গুণধরের হয়েছেটা কি?'

'অন্য গন্ধে নাক বন্ধ হয়ে গিয়েছে।'

'অন্য গন্ধ? সেটা কি?'

'না বড়বাবু, আর মুখ খোলাবেন না। ছোটমুখে বড় কথা হয়ে যাবে।'

'মারব এক থাবড়া। মেজাজটা নষ্ট করে দিস না।'

'ওই একজন এসেছিল।'

'একজন মানে?'

'খোকাবাবুর বন্ধু।'

'মাথায় কিস্যু ঢুকছে না। খোকার বন্ধুর সঙ্গে গন্ধের কি সম্পর্ক?'

'আজ্ঞে মেয়েমানুষ বন্ধু। একসঙ্গে পড়ে।'

'কখন এসেছিল?' নটবরের চোখ ছোট হল।

'দুপুরবেলায়।'

'তোদের মা জননী ছিল না ওপরে?'

'থাকবে না কেন? খাওয়া দাওয়ার পর ঘুমাচ্ছিল।'

'কেমন দেখতে?'

'বেশ ডাগরডোগর।'

'ফর্সা না শ্যামলা? ছিপছিপে না মোটা?'

'একেবারে সিনেমার নায়িকার মতো দেখতে।'

'বাঃ চমৎকার। ছেলে দিনদুপুরে বাড়িতে মেয়েছেলে নিয়ে এসে ফুর্তি করছে আর উনি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন। নাঃ, এসব নেহি চলে গা। ডাক, ডাক তাকে, আমি কথা বলব।'

'দোহাই বড়বাবু, আপনি মা জননীকে ডাকবেন না। উনি এখনও কিছু জানেন না। জানলে গুণধরের চাকরি চলে যাবে। মেয়েছেলেটা ঠিক ভরদুপুরে এসে খোকাবাবুর সঙ্গে এসে দেখা করতে চাইল। গুণধর সে কথা খোকাবাবুকে বলতেই খোকাবাবু

তাকে ওপরে নিয়ে যেতে বলল। সেই মেয়েছেলেটা অনেক গন্ধ মেখে এসেছিল। গুণধরের নাকে ওই গন্ধ ঢুকে গিয়েছে আজ।' এলোকেশী বলল।

কিন্তু ততক্ষণে নটবর উঠে দাঁড়িয়েছে। তিন-চার বার হাঁকাহাকি করতে গুণধর দৌড়ে এসে জানাল, মা জননী এখন খুব ব্যস্ত। একজন ভদ্রলোক এসেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, তিনি কথা কইছেন।

নটবর হুঙ্কার ছাড়ল, 'কে ভদ্রলোক?'

'তিনি বললেন আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। কিন্তু আপনি আহ্নিকে বসে কারও সঙ্গে দেখা করেন না বলতেই মায়ের সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন।'

'একটা বাইরের লোক কথা বলতে চাইল আর তোদের মা জননী সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল? এলোকেশী?'

'বলুন বড়বাবু!'

'তুই গিয়ে বল্ আমি এখন কথা বলতে চাই!'

এলোকেশী দরজা অবধি এগিয়ে দ্রুত সরে এল, 'উনি নেমে আসছেন। চলে যান তারপর গিয়ে বলছি।'

'গুণধর ডেকে নিয়ে আয় লোকটাকে।'

নটবর আরাম করে সোফায় বসল। এই সময় গুণধর যাকে নিয়ে ঘরে ঢুকল তার চেহারা নিতান্তই গোবেচারা।

'আমি নটবর দত্ত, মশাই-এর পরিচয়? আমার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার কী কথা থাকতে পারে ভেবে পাচ্ছি না।'

'নমস্কার। আমি কল্যান সোম। আপনি আহ্নিকে বসেছিলেন বলে বাধ্য হয়েছিলাম মিসেস দত্তের কাছে যেতে। কিন্তু তিনি আমাকে এভাবে অপমান করবেন আমি কল্পনাও করিনি।'

নটবর থমকে গেল। লোকটার চেহারা দেখে তার নিরীহ বলে মনে হচ্ছে। ওপরের ভদ্রমহিলা এঁকে কী করণে অপমান করতে যাবেন? সে বলল, 'ঠিক আছে, আপনি এখানে বসুন, আপনার পরিচয় দিন।'

একটু ইতস্তত করে কল্যাণবাবু বললেন, 'আমি স্বাতীলেখার বাবা।'

'সে কে?'

'আমার মেয়ের নামটা আপনি জানেন না দেখছি কিন্তু আপনার স্ত্রী জানেন। তার নাম বলতেই তিনি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে যা ইচ্ছে তাই বললেন। আমরা নাকি মেয়েকে ছেড়ে দিয়েছি আপনাদের ছেলেকে ফাঁদে ফেলতে। ছি ছি এসব কথা শুনব ভাবতেও পারিনি।' কল্যানবাবু বিমর্ষমুখে বললেন।

'আপনি কি এ বাড়িতে মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ওরা বেশ কিছুদিন ধরে মেলামেশা করছে। এবার বিয়ে না দিলে আত্মীয়স্বজনরা কথা বলতে শুরু করবে বলে ভয় পাচ্ছিলাম। কিন্তু আপনার স্ত্রী কোনওভাবেই শুনতে রাজি হলেন না। অথচ- - - ।'

'আমাদের ছেলের বাসনা কী?'

'আজ্ঞে, আমি আজই খবর পেলাম তারা সইসাবুদ করে ফেলেছে।'

'এ্যাঁ? বলেন কি? এ যে আমার ছেলে বিশ্বাসই হচ্ছে না। বাঃ বাঃ, বেশ। কাজের ছেলে। কাজকর্ম করে না অথচ সই করে ফেলল। আর আপনিও মশাই এমন পাত্রকে জামাই করতে চাইছেন, বলিহারি।'

'কী করব বলুন, আমি মেয়ের বাবা। মেয়ে যে আমাদের না জানিয়ে সই করবে কখনও ভাবিনি। এখন তো ফেলে দিতে পারি না।'

'ফেলে দেওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই। আপনার মেয়েও এ বাড়ির বউ হয়ে আসবে।'

'সত্যি। আপনি আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন না তো?'

'নো। কারও খামখেয়ালিপনা আমি বরদাস্ত করতে পারব না। সে আসবে। প্রয়োজন হলে এই একতলায় থাকবে। আপনি কোনও চিন্তা করবেন না।' বেশ জোরের সঙ্গে ঘোষণা করল নটবর।

কল্যানবাবু বিগলিত হলেন, 'আপনি দেবতুল্য মানুষ। কায়স্থের ছেলে হয়েও আহ্নিক করেন তখন তো আপনার চরিত্র আলাদা হবেই।'

নটবর মাথা নাড়ল, 'একদম নয়। আমি মাছ বিক্রি করে খাই। সন্ধের পর এই পোশাকে বসে আহ্নিক করি তা আমার শরীর মন তাজা রাখে। আজ এই প্রথম আলাপ, এর বেশি বলা ঠিক হবে না।'

'তাহলে বিয়ের আয়োজন-' কল্যানবাবু কথা শেষ করার আগেই বাইরে থেকে জোরালো গলা ভেসে এল, 'এলোকেশী'!

এলোকেশী ছুটে গেল দরজায়। সে পৌঁছানো মাত্র মা জননীর আদেশ শোনা গেল, 'ওঁদের বলে দে এই বিয়ে হবে না।'

'আলবাত হবে।' নটবর সমান গলায় বলল।

মা জননীকে দেখা যাচ্ছিল না কিন্তু তাঁর স্বর আরও উঠল, 'বংশ জানি না, চালচুলোর ঠিক নেই, পাল্টিঘর নয়, একেবারে কাঁধে চেপে বসলেই হল? আমার ছেলে কি তাঁর বাপের মতো ফ্যালনা?'

'কি? আমি ফ্যালনা?'

'নয়তো কি? বিজ্ঞাপন দেখে এসে আমার বাবাকে মজিয়েছিলে। তোমার নিজের কি ছিল?'

'তুমি আমাকে বাইরের লোকের সামনে অপমান করছ সন্ধ্যাশশী!'

'বেশ করেছি। আমার ছেলেকে যে পরের মেয়ের ফাঁদে ফেলতে চায় তার কোনও কথা শুনতে আমি রাজি নই।'

কল্যাণবাবু উঠে দাঁড়ালেন, 'আমি শুনেছিলাম, ঠিক শুনেছিলাম।'

নটবর জিজ্ঞাসা করল, 'কী শুনেছেন?'

'আপনাদের সম্পর্ক ভাল নয়। দুজনে ওপর নীচে আলাদা থাকেন।

'কে বলেছে আপনাকে?' মা জননীর গলায় প্রশ্ন।

'আপনার ছেলে আমার মেয়েকে বলেছে।'

'মিথ্যে কথা!' এবার ঘরে ঢুকলেন মা জননী।

'আমিকেন মিথ্যে বলব। আমার মেয়ে তার মাকে বলেছে। আপনাদের মধ্যে কোন সদ্ভাব নেই। নটবরবাবু অত্যন্ত নীচু মনের মানুষ। কুশ্রী চেহারার কাজের মহিলা নিয়ে নীচে থাকেন। এসব কথা আপনার ছেলের মুখ থেকেই আমরা জেনেছি। কিন্তু এখানে এসে দেখলাম নটবরবাবু অন্য ধরনের মানুষ।'

'তা তো দেখবেনই। যেই সে রাজি হয়েছে অমনি ভালমানুষ হয়ে গেল। এ্যাই, তুমি কি কানের মাথা খেয়েছ? বাইরের লোক এসে আমাদের সম্পর্ক নিয়ে কুকথা বলে যাচ্ছে অথচ কোনও রা কাটছ না?'

'ঠিক কথা। কল্যাণবাবু, আমাদের সম্পর্ক নিয়ে কোনও কথা বলবেন না।'

'আমি বলতে চাইনি, আপনাদের সম্পর্ক কি জানা সত্ত্বেও মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এখানে এসেছিলাম।'

'আপনার মেয়ে দুপুরবেলায় এ বাড়িতে আসত, জানেন?'

'না। তবে আপনার ছেলে যখন তখন আমার বাড়িতে হাজির হত।'

'বেশ। ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবতে দিন। তারপর কথা বলা যাবে। বুঝতেই পারছেন পরিস্থিতি এখন ভাল নয়।' নটবর হাত জোড় করল।

কল্যাণবাবু বেরিয়ে যাওয়ামাত্র মা জননী বলে উঠল, 'কালসাপ।'

'আমার এলাকায় এসে গালাগাল দিলে আমি সহ্য করব না সন্ধ্যাশশী।'

'তোমাকে আমি কিছু বলিনি।'

'এইমাত্র কালসাপ কাকে বললে?'

'যাকে পেটে ধরেছি। এতকাল বড় করেছি। বাড়ির কথা বাইরের মেয়েছেলেকে পেটখুলে গল্প করেছে? ছি ছি! আমাদের যে সম্পর্ক নেই তা সমস্ত পৃথিবীর লোক জেনে গেল?' সন্ধ্যাশশী যেন শিউরে উঠলেন।

নটবর হাসল, 'আমি কিন্তু কথার খেলাপ করিনি। ওপর থেকে নীচে নেমে আসার পর একবার মুখ খুলিনি।'

সন্ধ্যাশশী মাথা নাড়ল কিন্তু ছেলে তো বলে বেড়াচ্ছে!' তুমি আমাকে বাবা মারা যাওয়ার পর অপমান করেছিলে, বলেছিলে বাবা তোমাকে টাকা দিয়ে কিনে সাদা হাতির ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। বলনি?'

তুমি বলেছিলে আড়ত থেকে ফিরে নীচে থেকে সাবান দিয়ে স্নান করে উপরে উঠতে। বলনি?'

'তুমি বলেছিলে ফর্সা মেয়ে তোমার একদম ভাল লাগে না। আমি ময়দার তাল, সহবত জানি না। বলনি?'

'তুমি আমার মা তুলে গালাগাল দিয়েছিলে!'

'ও! তাই তুমি এতগুলো বছর আমার পাঠানো কালো কুচ্ছিত কাজের লোক নিয়ে নীচের তলায় ফুর্তি মেরেছ?'

'ফুর্তি মেরেছি? বেশ ডাকো তোমার এলোকেশীকে কদিন তো আছে, আমি তার সাথে কি ফুর্তি করেছি জিজ্ঞাসা করো। আমি মদ খাই বিড়ি খাই কিন্তু এতগুলো বছর সন্ন্যাসী হয়ে বাস করছি। হ্যাঁ।'

সন্ধ্যাশশী দু'পা এগোলেন, 'এ বিয়েতে তুমি রাজি হয়ো না গো।'

'কেন?'

'ওই ছেলে কালসাপ। ওর মুখ দেখব না আমি।'

'তাহলে তো ত্যাজ্যপুত্র করতে হয়।'

'তা কেন? এখন থেকে সে নীচের ঘরে থাকবে।'

'আর আমি?'

'ওপরের ঘরে। ওর ঘরে। এতদিন তো অভ্যেস নেই, একঘরে বেশিক্ষণ থাকলে গা গুলোবে। তাছাড়া পাঁচজনের মুখের ওপর ভাল জবাব দেওয়া যাবে। আমরা এক সঙ্গেই থাকি। সন্ধ্যাশশী দীর্ঘকাল বাদে চোখের কোণে হাসলেন।

রাত তখন দশটা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখে প্রশাধন লাগাচ্ছিলেন সন্ধ্যাশশী। এলোকেশী এলো, 'ডাকছিলে মা জননী?'

'হ্যাঁ। বড়বাবুর ওসব হয়ে গেছে?'

'কখন! নীচে বসেই আহ্নিক করে বিড়ি টেনে রাতের খাবার খেয়ে খোকাবাবুর ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছেন। মা জননী, খোকাবাবুর খবর পেলে? ছেলেটা কোথায় গেল?'

'কোথায় আর যাবে। ফোন করেছিল। বকুনি খেয়ে বলল আজ কোনও বন্ধুর বাড়িতে রাত্রে থাকবে। থাকুক। কাল এলে নীচে বিছানা করে দিবি। কুলাঙ্গার।' সন্ধ্যাশশী অনেক দিন পরে ঠোঁট রাঙালেন, 'এলোকেশী!'

'বলো মা জননী!'

'তুই তো নীচে থাকতিস, ঘুমাবার পরে বড়বাবু কি করে রে?'

'নাক ডাকে। যেন রাম রাবনে যুদ্ধ হয়।'

'আঃ বড়দের সম্পর্কে অমন কথা বলতে হয়। পুরুষমানুষ একটু নাক ডাকবেই, নইলে পুরুষ কিসের। আর কিছু করে না?'

'আর! হ্যাঁ, বেশি খেলে বলে সন্ধ্যাশশী আমার মাথা টিপে দাও, কম খেলে বলে এ্যাই পা টিপে দে।'

'ঘুমের ঘোরে বলে?'

'হ্যাঁগো।'

'যা তুই খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়।'

বাড়ি নিস্তব্ধ। শুধু ছেলের ঘর থেকে নাকডাকার আওয়াজ ভেসে আসছে। কী ভয়ঙ্কর শব্দ। আজ নীচে কথা বলার সময় তিনি এই কথাটা বলতে পারেননি। বিয়ের পর থেকে প্রতি রাত্রে এই শব্দ শুনতে হত তাঁকে। তখন এত আওয়াজ ছিল না। তবু না ঘুমিয়ে না ঘুমিয়ে মন বিদ্রোহ করেছিল শেষ পর্যন্ত। অথচ আজ আওয়াজটা তেমন খারাপ লাগল না। পা টিপে টিপে ছেলের ঘরের দরজায় এলেন সন্ধ্যাশশী। তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত আজ যা সাজ তা তিনি বিয়ের দিনেও বোধহয় সাজেননি। সিন্দুকে পড়ে থাকা নথটা শুধু অস্বস্তিতে ফেলেছে নাকটাকে।

লোকটা ঘুমোচ্ছে চিৎ হয়ে। কি মানুষ এতদিন পরে ওপরে এসেই ঘুম। সন্ধ্যাশশী পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। কি যেন বলেছিল এলোকেশী। কম খেলে মাথা আর বেশি খেলে পা? নাকি উল্টোটা? নাঃ, সব গুলিয়ে গেল তাঁর। এখন তো মেয়েটাকে জাগিয়ে জিজ্ঞাসা করে আসা যায় না। আর মুশকিল মানুষটা আজ কতটা খেয়েছে তা বুঝবেন কী করে। ঘুমিয়ে পড়লে নেশা কতটা কি বোঝা যায়?

সন্ধ্যাশশী ঝুঁকলেন সঙ্গে সঙ্গে মদ আর বিড়ির মেশানো গন্ধ ধক করে নাকে এল। দ্রুত আঁচল নাকে চেপেও তিনি সরিয়ে নিলেন। তারপর হাসি হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজ কত খেয়েছ গো? কম না বেশি?'

নটবর অঘোরে ঘুমাচ্ছিল। তার সাড়া পাওয়া গেল না।

সন্ধ্যাশশী আরও নরম করল গলার স্বর, 'আজ কত খেয়েছ? কম না বেশি?'

এবারও সাড়া পাওয়া গেল না।

সন্ধ্যাশশী স্বামীর বুকে হাত রাখলেন, 'কম খেয়েছ না বেশি? নটবরের নাক ডাকা থামল। শব্দ বের হল, 'উ!'

সন্ধ্যাশশী বললেন, 'কম না বেশি?'

সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে উঠে বসল নটবর।'কে কে কে এখানে? শালা একটু ঘুমানোর জো নেই। তুই আমার গায়ে হাত দিচ্ছিস এলোকেশী। মারব এক থাবড়া।'

সন্ধ্যাশশী চাপা গলায় বললেন, 'চুপ, চুপ।'

'অ। তুমি? অন্যরকম দেখাচ্ছে? ঘুমের সময় ঝামেলা করছ কেন?'

'কি? আমি ঝামেলা করছি?'

'করছি না?' নটবর বলল, 'ওপরে নিয়ে এসে যা ইচ্ছে তাই করবে?'

'যাও নামো খাট থেকে। নীচে যাও। পাড়া জাগিয়ে নাক ডাকাচ্ছ মোষের মতো? তাই বলতে এসেছিলাম, আর আমাকে চোখ রাঙানো হচ্ছে? যাও তোমার যেখানে জায়গা সেখানে যাও।'

চিৎকার করে উঠলেন সন্ধ্যাশশী।

'বেশ যাচ্ছি। পা ধরে ডেকে এনেছিলে এখন আবার তড়পানি।' হনহন করে নীচে নেমে গেল নটবর।

সন্ধ্যাশশী পাথরের মতো দাঁড়িয়েছিলেন। পাঁচ মিনিট পর যখন নীচ থেকে প্রতি রাতের মতো নাক ডাকার চাপা শব্দ ওপরে ভেসে এল তখন তিনি আচমকা স্বস্তি পেলেন। দিশি মদ আর বিড়ির গন্ধটা যা এতক্ষণ পেটে পাক খাচ্ছিল তা বের করে দিতে বেসিনের ওপর উপুড় হয়ে পড়লেন।

একমুখী রুদ্রাক্ষ

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে গিয়ে মাকে তুলে দিতে এসেছিল অর্জুন। অবশ্য মা একা নন, জলপাইগুড়ি শহরের আরও সাতজন পৌঢ়া মায়ের সঙ্গে আছেন। ওঁরা দার্জিলিং মেলে কলকাতায় পৌঁছেই দুন এক্সপ্রেস ধরে প্রথমে হরিদ্বার যাবেন। এই মহিলাদের সংগঠন তৈরি হওয়ার পর তাঁরা আর কারও ওপর নির্ভর করবেন না বলে ঠিক করেছেন। বছরে দু'বার নিজেরাই বেরিয়ে যাবেন ভারতবর্ষ দেখতে। এবার যাচ্ছেন হরিদ্বার হয়ে কেদার-বদ্রীনাথ।

কেদারনাথ-বদ্রীনাথ যাওয়ার ইচ্ছে মায়ের অনেকদিনের। বেশ কয়েকবার অর্জুনকে বলেছেন সে-কথা। বেড়াতে যেতে কার না ভাল লাগে। কিন্তু প্রতিবারই একটা না একটা ঘটনায় জড়িয়ে যাওয়ার আগে মাকে নিয়ে যাওয়া হয়নি। এখন মায়েদের সংগঠন 'ঘরোয়া' তৈরি হওয়ায় ওঁরা খুশি হয়েছেন। তবু যাওয়ার দিন সকাল থেকেই মায়ের মন খারাপ ছিল। তার ওপর দার্জিলিং মেলে জলপাইগুড়ি শহর থেকে ওঠা যাচ্ছে না। চার নম্বর গুমটিতে একটা অ্যাকসিডেন্ট হওয়ায় শহরে ট্রেন ঢুকছে না। জলপাইগুড়ি থেকে নিউজলপাইগুড়ি স্টেশনে ট্যাক্সি করে যাওয়ার সময় মা নিচু গলায় বলেছিলেন, 'তুই সঙ্গে গেলে খুব ভাল লাগত।'

দুটো ট্যাক্সি নিয়ে মহিলারা যাচ্ছিলেন। ওঁদের ট্যাক্সিতেও তিনজন আছেন। অর্জুন হেসে বলেছিল, "এটা তোমাদের 'ঘরোয়া' ভ্রমণ।" 'ঘরোয়ার অন্য সদস্যরা শুনতে পেয়ে হেসেছিলেন।

দার্জিলিং মেল ছাড়ল সাতটা পনেরো মিনিটে। অর্জুন মোটোর বাইক আনেনি। তাকে জলপাইগুড়ির বাস ধরতে স্টেশন থেকে রিকশা নিতে হবে। বেশি রাত হয়ে গেলে বাস পাওয়া যাবে না। ট্রেনটা প্লাটফর্ম ছেড়ে গেলে সে সিঁড়ি বেয়ে ওভারব্রিজে উঠে গেল অন্য প্লাটফর্মে ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। অনেকটা পথ ছুটে আসার পর।কিছুক্ষনের জন্য স্টেশনে দাঁড়ানো ট্রেন দেখতে অর্জুনের খুব ভাল লাগে। খানিকক্ষণ পরে গেলেও জলপাইগুড়ির বাস পাওয়া যাবে, অর্জুন ট্রেনটাকে দেখতে লাগল। তার পেছন দিয়ে যাত্রী এবং কুলিরা ছুটোছুটি করছে। একজন রেলের লোক আসছিলেন, অর্জুন তাকে জিজ্ঞেস করল, "এটা কোন ট্রেন দাদা?"

"কাঞ্চনজঙ্ঘা আজ বিফোর টাইমে ঢুকছে। অসাম যাবে।"

অর্থাৎ এই ট্রেন জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন দিয়ে যাবে। সেখানে নেমে রিকশা নিয়ে আধঘন্টার মধ্যে বাড়ি পৌঁছে যাবে সে। অর্জুন বলল, "আমি জলপাইগুড়ি যাব। একজনকে ট্রেনে তুলে দিতে প্লাটফর্ম টিকিট কেটে ঢুকেছি। এখন কি ওই ট্রেনে যাওয়ার টিকিট কাটার সময় আছে?"

রেলের কর্মচারি ঘড়ি দেখলেন, "একটু রিস্কি হয়ে যাবে। টিকিট কাউন্টার অনেক দূরে। প্ল্যাটফর্ম টিকিট আছে তো? চলুন, আমি গার্ডকে বলে দিচ্ছি।"

অর্জুনের খুব মজা লাগছিল। তার ফেরার কথা শিলিগুড়ি থেকে ছাড়া বাসে। বাসস্টপও বেশ দূরে। তার বদলে ট্রেনে গেলে সময় তো কম লাগবেই, বেশ ভালও লাগে।

আমাদের দেশের সরকারী কর্মচারীদের কাজকর্ম নিয়ে অনেক সামলোচনা হয়। কিন্তু তাঁদের মধ্যে সত্যিকারের কাজের লোক যদি না থাকতেন তা হলে দেশটা অচল হয়ে যেত। এই ভদ্রলোক সেই শ্রেণীতে পড়েন। গার্ডের সঙ্গে কথা বলে টিকিটের ব্যবস্থা করে দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

অর্জুন একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় জায়গা খোঁজার জন্যে ট্রেনের পাশ দিয়ে হাঁটছিল।, হঠাৎ তার নজর একটি মুখের ওপর পড়তেই সে খুব চমকে গেল। দ্বিতীয় শ্রেণীর স্লিপার কামরায় জানালার পাশে বসে আছেন অমল বোস। যদিও তাঁর মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল তবু চিনতে অন্তত অর্জুনের অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। পেছনে মাথা হেলিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে থাকার জন্যে তিনি অর্জুনকে দেখতে পেলেন না।

একটু সরে এসে অর্জুন কখনওই সত্যসন্ধানের কথা ভাবতে পারত না। এই মানুষটি প্রথমদিকে তাকে সহকারী হিসেবে সঙ্গে নিয়ে অনেক রহস্য সমাধান করেছেন। দিনের পর দিন ওঁর পাশে থেকে শিখেছে কী করে নিজেকে নির্লিপ্ত রেখে ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়। অমল সোম যখন উধাও হয়ে গেলেন, তখন সেই প্রথম দিকটায় খুব অসুবিধে হত অর্জুনের। কিন্তু সেটা কাটিয়ে উঠতে বেশি দেরি হয়নি।

এই অমল সোমকে আসামগামী এক দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় বসে থাকতে দেখবে বলে কল্পনাও করতে পারেনি অর্জুন। তার ইচ্ছে হচ্ছিল এখনই মানুষটার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, " আপনি কোথায় যাচ্ছেন? এতদিন কোথায় ছিলেন? বাড়িঘর ছেড়ে আর কতদিন এভাবে নিখোঁজ থাকবেন?"

কিন্তু নিজেকে সংযত করল অর্জুন। এসব প্রশ্ন করলে অমল সোম নিশ্চয় বিরক্ত বোধ করবেন। এমন তো হতে পারে উনি জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে নেমে নিজের বাড়িতে ফিরে যাচ্ছেন। সেক্ষেত্রে স্টেশনেই তো সে দেখা করতে পারে। এই সময় এঞ্জিন হুইসল্ দিতেই যাত্রিরা দৌড়ে ট্রেনে উঠতে লাগল। অর্জুন চটপট সামনের কামরার দরজা ধরল। ট্রেন চলতে শুরু করলেও ও দরজা থেকে সরল না। জলপাইগুড়ি রোডে পৌঁছনোর আগে অন্তত গোটাতিনেক স্টেশন পড়বে। অমল সোম তার কোনটায় যে নামবেন না তার তো ঠিক নেই। তার উচিত ছিল অমল সোমের কামরায় উঠে খানিকটা দূরত্ব রেখে লক্ষ রাখা।

এই সময় টিকিট চেকার এসে বললেন, "ভাই দরজা বন্ধ করে দিন। এই লাইনে সন্ধের পর প্রায়ই ডাকাতি হচ্ছে।"

দরজা বন্ধ করে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ডাকাতরা ধরা পড়ছে না?"

"না। অন্তত আমি জানি না।"

ট্রেনে ডাকাতি হচ্ছে এই খবর অর্জুনও শুনেছিল। এখন চেকার সেই কথা বলতে আশপাশের যাত্রীরা সেই আলোচনায় মত্ত হলেন। ডাকাতরা যাত্রী সেজে ওঠে। কে ডাকাত কে নয় বোঝা যায় না। এই যে ট্রেন চলছে, এই কামরায় ডাকাত থাকতে পারে। রিজার্ভেশন নেই এমন লোককে তাই কখনও উঠতে দেওয়া উচিত নয়, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অর্জুনের রিজার্ভেশন নেই, এত অল্প দূরত্বে যাওয়ার জন্যে রিজার্ভেশন করার প্রয়োজন নেই বলে গার্ডসাহেব বলেছেন। অর্জুন ঘড়ি দেখল, পরের স্টেশনে যখন কামরা বদল করবেই তখন এইসব কথা গায়ে না মাখাই ভাল। তা ছাড়া কথাগুলো নেহাত মিথ্যে নয়।

হঠাৎ চিৎকার চেঁচামেচি ভেসে এল। ছুটন্ত ট্রেনের যাত্রীরা চিৎকার করছে আর সেটা ভেসে আসছে পাশের কামরা থেকেই। এবং তখনই গুলির আওয়াজ কানে এল। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ট্রেন ধীরে ধীরে গতি কমিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেই পাশের কামরা থেকে কয়েকজন লাফিয়ে নীচে নামল। অর্জুন দরজা খুলতে যাচ্ছিল কিন্তু অন্য যাত্রীরা বাধা দিলেন, "খুলবেন না, খুলবেন না, ডাকাতি হচ্ছে। দরজা খোলা দেখলে ডাকাতরা এখানে উঠে আসবে।" কেউ চিৎকার করল, আশ্চর্য। ট্রেন দাঁড়িয়ে গেল কেন? এরকম জায়গায় ট্রেন দাঁড় করিয়েছে কেন? রেলের পুলিশরা অনান্য কামরা থেকে চলে এল। তাদের চেষ্টায় মিনিট কুড়ি বাদে ট্রেন ছাড়ল। পরের স্টেশনে ট্রেনটা

থামামাত্র দরজা খুলে নেমে পড়ল অর্জুন ততক্ষণে পাশের কামরার ক্ষুব্ধ যাত্রীরা প্ল্যাটফর্মে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছেন। ডাকাতরা তাদের অনেককেই নিঃস্ব করে গেছে। ওই কামরায় কোন রেল পুলিশ ছিল না কেন? এক যাত্রী যদি তাঁর অস্ত্র বের না করতেন তা হলে ডাকাতরা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে যেত। স্টেশন মাস্টারকে এইসব অভিযোগের জবাব দিতে হবে নইলে ট্রেন আটকে থাকবে। গোলমাল ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। কয়েকজন যাত্রীকে ডাকাতরা আহত করেছে, তাদের রেলের লোকরা নামিয়ে নিয়ে গেল শুশ্রূষার জন্যে। অর্জুন আক্রান্ত কামরায় উঠে এল। কামরাটা এখন প্রায় ফাঁকা। যারা বসে আছে তাদের মুখে এখনও আতঙ্কের ছাপ। কিন্তু অমল সোম নেই। যে জানলার পাশে তিনি বসে ছিলেন সেই জায়গাটা শূন্য।

অর্জুন কাছাকাছি একজনকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, এখানে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক বসে ছিলেন, মুখে দাড়িগোঁফ, কোথায় গেলেন?"

লোকটি বলল, "কোথায় গেলেন তা কী করে বলব, তবে উনি না থাকলে আরও লোকের বারোটা বাজত। ডাকাতগুলো ওঁর কাছে টাকা চাইতেই উনি রিভলভার বের করে উঁচিয়ে ধরতেই ওরা পিছু হটল। ট্রেন স্টেশনে এসে থামার পর ওই দরজা দিয়ে নেমে গেলেন।"

অর্জুন দ্রুত প্ল্যাটফর্মে নামল, স্টেশনটি অতি সাধারণ, প্ল্যাটফর্মের আলো তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে জ্বলছে। যেন জ্বলতে হয় বলেই জ্বলা। এক জায়গায় বেশ কিছু লোক দঙ্গল পাকিয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে, বাকি ট্রেনের যাত্রীরা ঝালমুড়ি বা চা খেতে ব্যস্ত। অমল সোম যে এখন প্ল্যাটফর্মে নেই তা বুঝতে অসুবিধে হল না অর্জুনের।

ওর খুব আফসোস হচ্ছিল। কী দরকার ছিল নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে দূর থেকে দেখে আড়ালে গিয়ে অনুসরণ করার? সোজা সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারত, "অমলদা, আপনি?"

তার পরেই মনে হল, অমলদা যদি জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে না নামতেন, তা হলে দূরে কোথাও যাওয়ার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ছিল। আর সেখানে যেতে হলে তাঁকে আবার এই ট্রেনে উঠতে হবে। তিনি তো কারও সঙ্গে এখন লুকোচুরি খেলছেন না যে নিজেকে আড়ালে রেখেছেন অর্জুনকে দেখে তাঁর গা ঢাকা দেওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই, অবশ্য তিনি যে অর্জুনকে দেখেননি, এ ব্যাপারে সে একশো ভাগ নিশ্চিত।

এই সময় আর-একটা কান্ড হল। ট্রেনযাত্রীদের সঙ্গে একে একে যোগ দিচ্ছিল স্থানীয় মানুষ। এই লাইনে রেল চলাচল নিয়ে তাদের যেসব অভিযোগ আছে তা এই সুযোগে জানাতে শুরু করল তারা। অর্জুন বুঝল এই ট্রেন কখন ছাড়বে তা কারও পক্ষে বলা সম্ভব নয়। রাত দুপুরে যদি জলপাইগুড়ি স্টেশনে নামে তা হলে বিপদে পড়তে হবে। অর্জুন ঠিক করল সে বাসে যাবে। ট্রেন লাইন থেকে বাসের রাস্তা খুব বেশি দূরে নয়।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে কয়েক পা হাঁটতেই অন্ধকার শুরু হয়ে গেল। পথ পিচের নয় এবং দু'ধারে ল্যাম্পপোস্ট নেই। কিন্তু লোকজন ছুটছে স্টেশনের দিকে। যেন ওখানে মজার কোনও ঘটনা ঘটেছে। এই সময় একটা খালি রিকশা বেল বাজাতে বাজাতে ছুটে আসছিল। অর্জুন কোনওমতে সেটাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, ''ভাই, বাসস্টপ কত দূরে।''

''অনেক দূরে! হেঁটে গেলে ভোর হয়ে যাবে।'' লোকটা খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসল।

''পৌঁছে দিতে কত ভাড়া নেবে?''

''দশ টাকা। তার নীচে গেলে পোষাবে না। পেঁয়াজের দাম আবার বাড়ছে।''

পেঁয়াজের দাম বাড়লে রিকশার ভাড়া কেন বাড়বে এ প্রশ্ন করা অবান্তর। কোনও আপত্তি না করে রাজি হয়ে গেল অর্জুন।

রিকশা ঘুরিয়ে রিকশাওয়ালা বলল, ''ভগবানের লীলা বোঝা দায়। সারাদিন রিকশা নিয়ে বসে ছিলাম, দশটা টাকাও রোজগার হয়নি। অথচ যেই ট্রেন বন্ধ হল, পর পর প্যাসেঞ্জার পেয়ে গেলাম, দশ দশ কুড়ি।''

''তুমি আমার আগেও এখান থেকে প্যাসেঞ্জার নিয়ে গেছ।''

''হ্যাঁ, এক বাবুকে ছেড়ে দিয়ে এলাম এইমাত্র।''

অর্জুনের খটকা লাগল, ''ভদ্রলোকর কি দাড়ি ছিল?''

''না তো! মাথার টাক একেবারে গলায় নেমে গেছে।''

বর্ণনা শুনে হাসি পেল অর্জুনের। যা হোক, অমল সোম তা হলে রিকশা নিয়ে বাসস্টপের দিকে যাননি!

রাস্তাটা ফুড়ুত করে ফুরিয়ে গেল। বড় রাস্তার পাশে গোটা পঁচেক দোকানে টিমটিমে আলো জ্বলছে। কয়েকটা পুলিশের গাড়ি হেড লাইট জ্বালিয়ে স্টেশনের দিকে ছুটে গেল। ভাড়া মিটিয়ে দিতেই রিকশাওয়ালা ছুটল স্টেশনের দিকে। দুটো বাস রেষারেষি করতে করতে শিলিগুড়ির দিকে চলে গেল। জলপাইগুড়ির দিকে যাওয়ার বাসের কোনও চিহ্ন নেই।

এখন রাত সাড়ে আটটা। অর্জুন দোকানগুলোর সামনে পৌঁছে একজনকে জিজ্ঞেস করল, ''জলপাইগুড়ি যাওয়ার বাস কোথায় দাঁড়ায় দাদা?''

''এখানেই।''

''এখন বাস আসবে তো?''

''ক'টা চান? সাড়ে দশটা পর্যন্ত এসেই যাবে।''

ওপাশে একটা চায়ের দোকান। একটু চা খেলে মন্দ হয় না। বেঞ্চিতে বসে এক গ্লাস চায়ের অর্ডার দিল অর্জুন। আজকের রাতের খাবার মা তৈরি করে দিয়ে গেছেন। কাল থেকে কাজের লোকের ওপর নির্ভর করতে হবে। চোখ বন্ধ করে চায়ের গ্লাসে

চুমুক দিতে দিতে অর্জুন ভাবছিল এই সুযোগে রান্না নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করলে কেমন হয়?

"এত রাতে শুধু চা খাচ্ছ কেন? সঙ্গে কিছু নিলে পারতে।"

গলা শুনে চমকে মুখ তুলে তাকাতেই অর্জুন অমল সোমকে দেখতে পেল। সে তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠল, "অমলদা?"

"নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে কী করছিলে?"

"মাকে দার্জিলিং মেলে তুলতে গিয়েছিলাম। আপনি আমাকে দেখেছিলেন?"

"পাশের কামরায় লাফ দিয়ে উঠতে দেখলাম বলে মনে হয়েছিল। তারপর, তোমাদের খবর কী? সবাই ভাল আছ তো?' অমল সোম দাঁড়িয়ে ছিলেন।

"হ্যাঁ। আপনি কি জলপাইগুড়িতে যাচ্ছেন?"

"সেরকমই ইচ্ছে ছিল।"

এ-কথা শোনার পর অর্জুনের আর চা খাওয়ার ইচ্ছে হল না। চায়ের দাম মিটিয়ে দিয়ে অমল সোমের সঙ্গে বাইরে এসে দাঁড়াল।

অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি তো বাড়ি ফিরে যাচ্ছ?"

"আপনি?"

"আমি? এই কাছেই একটি ছেলের বাড়ি। ভাবছি তার সঙ্গে দেখা করব।"

"কে? আমি চিনি?"

"তুমি চিনবে কী করে? রেলে যারা ডাকাতি করে তাদের সঙ্গে তো তোমার সম্পর্ক থাকার কথা নয়।" অমল সোম হাসলেন।

"রেলডাকাত?"

"হ্যাঁ। একটু আগে যারা আমাদের কামরায় ডাকাতি করেছিল তাদের মধ্যে সে ছিল। মুশকিল হল ওরা যেখানে ট্রেন থেকে নেমে পালিয়েছে সেই জায়গাটা এখান থেকে অন্তত মাইলপাঁচেক দূরে। পালিয়ে বাসরাস্তায় পৌঁছে যদি সরাসরি বাড়িতে ফিরে আসে তা হলেও এতক্ষণে পৌঁছেছে বলে মনে হয় না।"

অর্জুন অবাক হয়ে গেল। অমল সোম এমন গলায় বললেন যেন কোনও প্রিয়জনের সম্পর্কে কথা বলছেন। সে জিজ্ঞেস করল, "ওই ডাকাতের বাড়িটা আপনি চেনেন?"

"না চিনি না। তবে চিনে নিতে পারব।"

"তা হলে তো পুলিশকে খবর দিলেই হয়।"

"আগে দেখি আমার ধারণাটা সঠিক কি না। আচ্ছা!"

"অমলদা, আমি আপনার সঙ্গে যেতে চাই।"

"যাবে? বেশ তো, চলো। আমার আজকাল বেশিক্ষণ কথা বলতে ভাল লাগে না, তোমার অসুবিধে হতে পারে।" অমল সোম হাঁটতে শুরু করলেন। এতক্ষণে অর্জুন লক্ষ

করল একটা বড় চামড়ার মোড়া ছাড়া অমল সোমের সঙ্গে কোনও জিনিসপত্র নেই। উনি কোথায় ছিলেন, ক'দিনের জন্যে আসছেন তা জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে হলেও নির্লিপ্ত হয়ে হাঁটতে লাগল।

আধা অন্ধকারে দু'জন আসছিল। অমল সোম তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, মন্ডলপাড়া কত দূর?"

একজন জবাব দিল, "এই তো, ওপাশটা মন্ডলপাড়া। কার বাড়ি যাবেন?"

"নামটায় একটু গোলমাল হচ্ছে। শিবু, মহাদেব বা শিবনাথ।"

"এই নামে তো মন্ডলপাড়ায় কেউ নেই। কী করে?"

"সবাই জানে সে বেকার। কিন্তু ইদানীং রেলে ডাকাতি করছে।"

"সে কী! কী বলছেন আপনি!"

"হ্যাঁ ভাই। সেইজন্যেই তো দেখা করতে চাইছি।"

"আপনি কি পুলিশ?"

"দুর। আমাকে দেখে তো তা মনে হওয়ার কথা নয়।"

"তাকে দেখতে কেমন বলতে পারো?"

"নিশ্চয়ই। লম্বা, রোগা, কোঁকড়া চুল। তবে মনে হয় একটুও সাহসী নয়, উলটে ভিতুই বলা যায়।"

"এরকম একজনকে চিনি। চলুন তো।"

দু'জন আগে যাচ্ছিল, ওরা পেছনে। অর্জুন না জিজ্ঞেস করে পারেনি, "অমলদা, ডাকাতরা তো অনেক ছিল, এই ছেলেটিকে কী করে অপনি ঠাওর করলেন?"

"কোনও কৃতিত্ব নেই আমার। ডাকাতি করার আগে ওরা যাত্রী সেজে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কামরায় বসে ছিল। এই ছোকরা আর তার সঙ্গী বসে ছিল আমার পাশে। সঙ্গী সিনেমার গল্প করতেও ওর তাতে মন ছিল না। হঠাৎ বলল, 'মন্ডলপাড়ার অনেক আগে নামতে হবে।' সঙ্গীটি বলল, 'তুই খুব ঘাবিড়ে আছিস ভোলানাথ।' ছেলেটি প্রতিবাদ করল, 'অ্যাই, আমার নাম ভোলানাথ নয়।' সঙ্গী বলেছিল, 'তুই একটা গাধা। আসল নামে ডাকতে নিষেধ করেছেন বস, মনে নেই।' তারপর ডাকাতি আরম্ভ হতেই ওরা স্বরূপ ধরল। কিন্তু এই ছেলেটি এত নার্ভাস ছিল, আমার দিকে ছুরি উঁচিয়েও ঠিকমতো ধরে রাখতে পারছিল না। যাকগে, এখানকার স্টেশনে নেমে জিজ্ঞেস করতেই জানতে পারলাম মন্ডলপাড়া বেশি দূরে নয়। ভাবলাম ছেলেটির খোঁজ নিয়ে যাই।" অমল সোম যখন এইসব কথা বলছিলেন তখন ওরা একটা গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। একটা মুদির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পথপ্রদর্শক দু'জন কয়েকটা কথা বলে ঘুরে দাঁড়াল, "না, ওই নামে কেউ এখানে থাকে না। তবে যে চেহারা বলছেন তার সঙ্গে একজনের মিল আছে।"

"কী নাম তার?" অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন।

"বিশ্বনাথ মন্ডল। বৈদ্যনাথ মন্ডলের ছেলে।"

অমল সোম হাসলেন, " বাঃ, ওটাও তো ভোলানাথের নাম। তা বৈদ্যনাথবাবুর বাড়িটা একটু দেখিয়ে দেবেন।"

দু'জনে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে জানাল তারা ওই বাড়িতে যাবে না। বৈদ্যনাথ লোক সুবিধের নয়। সত্যি যদি গোলমেলে ব্যাপার থাকে তা হলে ওরা জড়াতে চায় না। এখান থেকে সোজা এগিয়ে গেলে বাঁ দিকে একটা বটগাছ পড়বে তার গায়ের বাড়িটা ওদের।

লোকদুটো চলে গেল না। মুদির দোকানের বেঞ্চিতে বসে পড়ল। অথচ ওরা নিশ্চয়ই একটু আগে কোনও কাজে বাস রাস্তা ধরে হাঁটছিল।

বটগাছের পাশের বাড়িটায় আলো জ্বলছিল। যদিও এই গ্রামে ইলেকট্রিক এসে গেছে তবু তার আলোয় তেজ নেই। বৈদ্যনাথবাবুর বাইরের ঘরের দরজা খোলা। সেখানে পৌঁছে দেখা গেল একজন বছর ষাটের মানুষ মাটিতে মাদুর পেতে শুয়ে আছেন।

অমল সোম ডাকলেন, "বৈদ্যনাথবাবু আছেন?"

"কে? কে?" ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন বৃদ্ধ। তাঁর পরনে লুঙ্গি, ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। পাশে রাখা চশমা তুলে নাকের ওপর বসালেন।

"আপনি আমাদের চিনতেন না।"

"অ। শহরের লোক বলে মনে হচ্ছে।"

"আমি এখন শহরের নই। এর নাম অর্জুন, জলপাইগুড়িতে থাকে। আমি অনেক দূর থেকে আসছি।"

"অ। তা কী করতে পারি?"

"অনেকটা হেঁটে এসেছি, একটু বসতে বলবেন না?"

"উদ্দেশ্য কী তা না জানলে, হেঁ হেঁ, বুঝতেই পারছেন, যে খারাপ দিনকাল হয়ে গেছে, তা আসুন, মাদুরে বসুন।"

জুতো খুলে অমল সোমকে অনুসরণ করল অর্জুন। জুত করে বসে অমল সোম বললেন, "আপনি তো এই গ্রামের সম্মানীয় ব্যক্তি।

"ছিলাম। এখন পঞ্চায়েত নির্বাচনে হেরে গিয়ে একঘরে হয়ে আছি। জাল ভোট দিয়ে হারিয়ে দিল ওরা। এর আগের বার পঞ্চায়েতের সুবাদে কিছু করতে পেরেছিলাম বলে এই বুড়ো বয়সে কিছু খেতে পারছি। যাকগে, উদ্দেশ্যটা বললেন না?"

"আপনার ছেলের নাম বিশ্বনাথ?"

"হ্যাঁ, ছয় মেয়ের পর ওই ছেলে। বিশ্বনাথের কাছে মানত করে আমার স্ত্রী পেয়েছিলেন। জন্ম দিতে গিয়ে মারা যান বলে আর কাশীতে গিয়ে পুজো দিয়ে আসা হয়নি। কেন?"

"ছেলে কী করে?"

"কিসসু না। মানে এতকাল কিসসু করত না। তবে ইদানীং ব্যবসায় নেমেছে। অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা। গত সপ্তাহে দুই হাজার টাকা দিয়েছে আমাকে। প্রথম রোজগারের টাকা।" বৈদ্যনাথকে বেশ গর্বিত দেখাল।

অমল সোম বললেন, "বাঃ, খুব ভাল খবর। তা আপনার ছেলে যে অর্ডার সাপ্লাই করে, করার আগে সেই জিনিস তো বাড়িতে এনে রাখে, তাই না?"

"হ্যাঁ।, উঠোনের পাশে একটা ঘর খালি পড়ে ছিল, ওটাকেই গুদামঘর করেছে।" বৈদ্যনাথ কথা ঘোরালেন, "কিন্তু আপনারা ছেলে সম্পর্কে এত প্রশ্ন করছেন কেন? মনে হচ্ছে ওর বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এসেছেন?"

অমল সোম হাসলেন, কিন্তু কথা বললেন না।

বৈদ্যনাথবাবু মাথা নাড়তে লাগলেন, " না মশাই, ছেলের বিয়ে আমি এত তাড়াতাড়ি দেব না। কত আর বয়স। আগে ব্যবসায় ভাল করে দাঁড়াক, আমাকে মাসে অন্তত সাত-আট হাজার টাকা রেগুলার দিক, তারপর ভাবা যাবে।"

আমল সোম বললেন, "সে তো ঠিক কথা। ছেলে বাড়িতে আছে?"

"না, না। শিলিগুড়ি থেকে বাড়ি ফেরে শেষ বাস ধরে।"

"তা হলে তো অনেক রাত হবে। অতক্ষণ অপেক্ষা করা যাবে না। আপনি ওকে বলবেন আগামীকাল সকালে আমার সঙ্গে দেখা করতে। জলপাইগুড়ির হাকিমপাড়ায় গিয়ে অমল সোমের নাম বললে যে কেউ বাড়িটা দেখিয়ে দেবে।" অমল সোম উঠে দাঁড়াতে অর্জুনও উঠল।

বৈদ্যনাথবাবু বসে বসেই জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন? আপনার বাড়িতে যাবে কেন? আপনি কে জানি না, হুকুম করলেই সে আপনার বাড়িতে চলে যাবে?"

"সে না গেলে পুলিস এখানে আসবে। শুধু তাকে নয় আপনাকেও ধরে নিয়ে যাবে। বেশ কয়েক বছর হাজতে থাকতে হবে আপনাদের।"

বৈদ্যনাথবাবু উঠে দাঁড়ালেন, "আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন? বাড়ি বয়ে এসে পুলিশের ভয় দেখাচ্ছেন?"

অমল সোম বললেন, "ভয় দেখাচ্ছি কিনা সেটা ছেলের সঙ্গে কথা বললেই বুঝতে পারবেন। শ্রীমান ভোলানাথ আজ সন্ধেবেলায় ট্রেনে যা করেছেন তা ওর মুখ থেকে শুনতে এসেছিলাম, আপনিও শুনে নেবেন।"

"আমার ছেলের নাম বিশ্বনাথ, ভোলানাথ নয়।"

"ওই একই হল, ওর সঙ্গীরা ওকে ভোলানাথ বলে ডাকে, জেনে নেবেন।" কথাগুলো বলে অমল সোম বেরিয়ে এলেন। বৈদ্যনাথবাবুর গলা দিয়ে কোনও শব্দ বের হচ্ছিল না। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি যখন এত নিশ্চিত তখন ছেলেটাকে পুলিশে না ধরিয়ে দিয়ে এইভাবে চলে এলেন কেন?"

অমল সোম বললেন, '' প্রথম কথা, এখানে আসার আগে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলাম না। দ্বিতীয় কথা, আমি পুলিশকে বললে পুলিশ নিশ্চয় ওকে ধরত কিন্তু প্রমাণ করতে পারত না। আমি ছাড়া আর কেউ সাক্ষী হিসাবে এগিয়ে আসবে বলে মনে হয় না। ওই কামরায় যারা ছিল তার আজ রাতের পর যে যার জায়গায় চলে যাবে। পুলিশ তাদের হদিস পাবে না। শুধু একজনের সাক্ষীর ওপর বিচারক নির্ভর করবেন বলে মনে হয় না। তৃতীয়ত ডাকাতির সময় এই ছেলেটি তার সঙ্গীদের বারংবার মনে করিয়ে দিচ্ছিল যেন কারও ওপর অত্যাচার না করা হয়। এটা থেকে মনে হয়েছে ছেলেটা এখনও ওই লাইনে দক্ষ হয়ে ওঠেনি। আমার হাতে রিভলভার দেখামাত্র চুপচাপ চলে গেছে দরজার কাছে।''

''আপনার মনে হচ্ছে ছেলেটা কাল সকালে দেখা করবে?''

''দুটো ঘটনার যে-কোনও একটা ঘটতে পারে। প্রচন্ড ভয় পেয়ে নার্ভাস হয়ে ছেলেটা আমার কাছে আসতে পারে। ওর বাবা যদি জানান আমি পুলিশ নই তা হলে ধরা পড়ার আগে এই রাস্তাটা খুঁজবে। নয়তো ওর দলবলকে গিয়ে বলবে, তারা আমাকে আক্রমন করে মুখ বন্ধ করতে চাইবে। শেষটা হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ অপরাধীরা সাক্ষীর বেঁচে থাকা পছন্দ করে না।'' অমল সোম দাঁড়িয়ে গেলেন কারণ সেই দুই পথপ্রদর্শক মুদির দোকান ছেড়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

''ওর বাপের দেখা পেয়েছেন?'' একজন জানতে চাইল।

''হ্যাঁ। আপনাদের অনেক ধন্যবাদ।''

''তা হলে বলছেন এই বিশু ছোকরা ট্রেনডাকাতি করছে?''

''তাই যদি করে তা হলে আপনারা কী করবেন?''

''আমরা পঞ্চায়েত ডেকে ওকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেব।''

''তখন ও আরও বড়ও ডাকাতি করবে, তাই না? হয়তো সঙ্গীদের নিয়ে আপনাদের ওপর বদলা নেবে। অবশ্য যা করার তা আপনারা নিশ্চয়ই করতে পারেন। নমস্কার।'' অমল সোম আবার হাঁটতে শুরু করলেন।

বাসরাস্তায় এসে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, ''আপনি কি জলপাইগুড়ির থানায় ব্যাপারটা জানিয়ে রাখবেন?''

''না, না। কয়েকদিনের জন্যে এসেছি, ঝামেলা বাড়ানোর কী দরকার। দ্যাখো, আমি ইচ্ছে করেই ওর বাবাকে বলিনি ছেলে কী করছে। কিন্তু ওই দুজনকে বলেছি। কাল সকাল হওয়ার আগেই পুরো গ্রামের মানুষ জেনে যাবে বিশুনাথ ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে। ওর বাবার ওপর যাদের রাগ আছে তারা খবরটা বেশি করে ছড়াবে। এই চাপটা বিশুনাথের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। ও অথবা ওরা আসবেই।''

একটা বাস পাওয়া গেল। ওরা যখন জলপাইগুড়ির কদমতলায় বাস থেকে নামল তখন রাত প্রায় এগারোটা। অর্জুন বলল, "অমল দা অনেক রাত হয়ে গেছে, রাতটা আমাদের বাড়িতে থেকে যান।"

"তোমাদের বাড়ি খালি পড়ে আছে, তাই না। বেশ চলো। এত রাতে শ্রীমান হাবুকে জাগিয়ে খাবার তৈরি করতে বলা অন্যায় হবে। তোমার ওখানে সে ব্যবস্থা আছে তো?"

"মা যাওয়ার আগে অনেকটা তৈরি করে গেছেন। কোনও সমস্যা হবে না।"

।।২।।

অমল সোম এই প্রথমবার অর্জুনের বাড়িতে রাত্রিবাস করলেন। অর্জুনের খুব ভাল লাগছিল। খাওয়া দাওয়ার পর অমল সোম বললেন, "তুমি ইচ্ছে করলে শুয়ে পড়তে পারো। আমি একটু জেগে থাকব।"

"আপনি কি দেরি করে ঘুমোন?"

"হ্যাঁ। একটা থেকে পাঁচটা।"

"অসুবিধে হয় না?"

"সব কিছু অভ্যেসের ওপর নির্ভর করে।"

শেষ পর্যন্ত অর্জুন প্রশ্নটা করে ফেলল, "অমলদা, আপনি এই জীবন যাপন করছেন কেন? আপনার কি স্বাভাবিক জীবন সম্পর্কে কোনও আগ্রহ নেই?"

"স্বাভাবিক জীবন বলতে কি ধরাবাঁধা সাংসারিক জীবন বোঝাচ্ছ?"

"হ্যাঁ, ব্যাপারটা সে রকমই দাঁড়িয়ে যায়।"

"অনেককাল তো সে-জীবন যাপন করেছি। তাই স্বাদ বদলালাম।"

"এখন আপনি কোথায় থাকেন?"

"যখন যেখানে ভাল লাগে। কখনও যোশিমঠের কাছে এক আশ্রমে, কখনও হৃষীকেশে। আসল সকল সাধুদের সঙ্গ বেশ উপভোগ করি। তবে কিছু উপকারও হয়েছে। এখন আমি মনঃসংযোগ করতে পারি।"

"আগে পারতেন না?"

"আমি সেই মনঃসংযোগের কথা বলছি, যা শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আমার ক্ষমতা অবশ্য খুবই সামান্য। কিন্তু হিমালয়ে অনেক সাধু আছেন যাঁদের ক্ষমতা দেখলে বিজ্ঞান বিচলিত হয়ে যাবে।" অমল সোম হাসলেন, "এবার শুয়ে পড়ো। যাওয়ার সময় দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাও।"

সকালবেলায় ওরা হাঁটতে হাঁটতে চলে এল হাকিম পাড়ায়। অমল সোমকে প্রায়ই থামতে হচ্ছিল, কারণ পথচারীদের কেউ কেউ তাঁকে দেখে অবাক হয়ে নানান প্রশ্ন করছিলেন।

বাড়ির সামনে পৌঁছে অমল সোম বললেন, "হাবু তোমার সঙ্গে দেখছি নিয়মিত দেখা করে। এরকম মানুষ পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু ভাবছি এবার বাড়িটাকে বিক্রি করে দেব। আমার পরে তো এখানে কেউ বাস করার নেই। ওই হাবুটার জন্যে যদি একটা আশ্রম টাশ্রমের ব্যবস্থা করতে পারি!"

"আপনার কেন মনে হচ্ছে হাবু আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে?"

"বাগানটা এখনও আগের মতো পরিষ্কার। হাবু যত্ন করছে। শুধু যত্নে তো হয় না। টাকাও দরকার। তোমার কাছে না গেলে তুমি ওকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে দেবে। অর্থাৎ সেটা সে করছে।"

গেট খুলে ভেতরে ঢুকে অমল সোম বেশ জোরেই ডাকলেন, "হাবু।" কিন্তু কোনও সাড়া এল না। অথচ অমল সোমের বাইরের দরজা খোলা। ওরা বারান্দায় উঠতেই অমল সোম দ্বিতীয়বার ডাকলেন। এবারও সাড়া নেই। ভেতরে ঢুকে অর্জুন বুঝতে পারল প্রলয় হয়ে গিয়েছে। জিনিসপত্র লন্ডভন্ড, চেয়ার ভেঙেছে, টেবিলের জিনিসগুলোর ওপর অত্যাচার হয়েছে।

অমল সোম দ্রুত ভেতরের বারান্দায় এলেন। উঠোনের ওপাশের তিনটে ঘরের একটায় হাবু থাকে। সেখানে হাবুকে পাওয়া গেল। তার হাত-পা বাঁধা, মুখে গলায় প্রহারের চিহ্ন স্পষ্ট। অমল সোমকে দেখামাত্রই হাবুর দু'চোখ থেকে জল বেরিয়ে এল। দ্রুত ওকে বাঁধনমুক্ত করতেই হাবু অমল সোমের পায়ের ওপর পড়ে গিয়ে অদ্ভুত স্বরে কাঁদতে লাগল। অমল সোম ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। মাথায় গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, "অর্জুন দ্যাখো তো, আমার ফার্স্ট এইডের বাক্সটা এখনও আছে কি না।"

সেটাকে খুঁজে পেয়ে নিয়ে এল অর্জুন। অনেক চেষ্টায় হাবুকে শান্ত করে ওষুধ লাগালেন অমল সোম। তারপর অদ্ভুত দৃশ্যটি দেখল অর্জুন। হাবু কথা বলতে পারে না এবং কানে শোনে না। কিন্তু তার চোখ মুখ চমৎকার কথা বলে। হাবু হাত নেড়ে চোখ ঘুরিয়ে মুখ বেঁকিয়ে কথা বলে যাচ্ছে আর তার সঙ্গে সমানে একই ভঙ্গি করছেন অমল সোম। মিনিট চারেক ধরে এই নির্বাক দৃশ্যটি দেখে গেল অর্জুন। হাবুর ইশারার সঙ্গে অর্জুন পরিচিত। সেটা ও যখন ধীরে-ধীরে করে তখন বুঝতে অসুবিধে তেমন হয় না। কিন্তু এখন হাবু যে দ্রুততায় তার বক্তব্য জানাচ্ছে তা অর্জুনের কাছে অস্পষ্ট।

অমল সোম উঠে দাঁড়ালেন, "দোষ আমারই।"

"কেন?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"আমি ভেবেছিলাম ও অথবা ওরা আজ সকালে এখানে আসবে। এই বোকামি আমি করে ফেলেছি।"

"তার মানে? কাজটা বিশ্বনাথের?"

"হ্যাঁ। ওরা এসেছিল ভোর রাতে। ছ'জন। আমাকে বাড়িতে না পেয়ে খুব হতাশ হয়ে হাবুর ওপর অত্যাচার চালিয়েছে। হাবু যে কথা বলতে পারে না এটা সম্ভবত বুঝতে পারেনি।" অমল সোমকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল।

"ভাগ্যিস আপনি গতরাতে আমাদের বাড়িতে ছিলেন?"

"সেটা হাবুর দুর্ভাগ্য। আমি থাকলে ওকে কষ্ট সহ্য করতে হত না। কিন্তু আমি ভাবছি ওই ভোরে ওরা আমার বাড়ি খুঁজে বের করল কী করে? তখন জিজ্ঞেস করার মতো মানুষ তো রাস্তায় থাকে না।"

"মর্নিং ওয়াকে যারা বের হয় তারাই বলে দিয়েছে বাড়ির হদিস। আমার মনে হয় এবার থানায় খবর দেওয়া উচিত।"

"হ্যাঁ। অবশ্যই। তুমিই কাজগুলো করো।"

থানায় চলে এল অর্জুন। নতুন দারোগাবাবু সুদর্শন ব্যানার্জি মাস চারেক হল জয়েন করেছেন। ইতিমধ্যেই অর্জুনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়ে গেছে। ভদ্রলোককে দেখলে অধ্যাপক বলে মনে হয়, পুলিশের ছাপ ওঁর মুখে নেই।

"আসুন অর্জুনবাবু। সুপ্রভাত।" সুদর্শন তাঁর চেয়ারে বসেছিলেন।

"নমস্কার। কিন্তু আজকের সকালটা আমাদের কাছে শুভ নয়।"

"সে কী! বসুন।"

অর্জুন সংক্ষেপে গত সন্ধ্যা থেকে যা যা ঘটেছিল তা বলে গেল। অমল সোম কে এবং অর্জুনের জীবনে তাঁর কী ভূমিকা সে ব্যাপারে সুদর্শন আগেই জানতেন। পুরোটা শোনার পর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "একটা ব্যাপারে আমার খটকা লাগছে। মিস্টার সোম যখন বুঝতেই পারলেন বিশ্বনাথ ট্রেনডাকাতি করেছে তখন কাল রাত্রেই পুলিশকে জানালেন না কেন?"

"উনি প্রথমে বলেছিলেন ওঁর ধারণা ঠিক কিনা যাচাই করতে চান। পরে নিঃসন্দেহ হওয়ার পর বললেন, পুলিশ ছেলেটাকে অ্যারেস্ট করতে পারে ঠিকই কিন্তু প্রমাণের অভাবে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। বিশ্বনাথ যে ট্রেন ডাকাতি করেছে সে-কথা প্রমাণের জন্যে পুলিশ কাউকে সাক্ষী হিসেবে পাবে না।"

"কেন? উনি তো ছিলেন?"

"ওঁর একার সাক্ষী যথেষ্ট নয় বলে ওঁর ধারণা।"

"কিন্তু পুলিশকে জানালে ওঁর বাড়িতে হামলা করতে পারত না ওরা। আচ্ছা, আর-একটা কথা, মিস্টার সোম কি কখনও আপনাদের বাড়িতে রাত্রে থেকেছেন?"

"না। ওঁর বাড়িতে অত রাতে খাওয়ার অসুবিধে হবে বলে আমি ওঁকে অনুরোধ করলে উনি শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে যান।"

"এই রাজি হয়ে যাওয়াটা ওঁর অতীতের আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে একটু অস্বাভাবিক বলে মনে হয়নি আপনার?" সুদর্শণ জিজ্ঞেস করলেন।

"আপনি কী বলতে চাইছেন?"

"আমার মনে হচ্ছে মিস্টার সোম জানতেন তাঁর বাড়িতে হামলা হবে।"

"হ্যাঁ। যদি বিশ্বনাথ একা না আসে তা হলে দলবল নিয়ে আসবে এটা ওঁর অনুমানে ছিল। কিন্তু সেটা রাত্রেই নয়, আজ দিনের বেলায় বলে ভেবেছিলেন উনি।" অর্জুন একটু বিরক্ত হল।

সুদর্শণ নিজেই ডায়েরিতে সব লিখে নিলেন। তারপর বললেন, "চলুন, এই সুযোগে মিস্টার সোমের সঙ্গে কথা বলে আসি।"

অর্জুন আপত্তি করল না, যদি ভদ্রলোক সাধারণ গল্প করতেও যান তা হলে এটা ওঁর তদন্তের মধ্যেই পড়বে। যদিও অমল সোম সেটা পছন্দ করবেন না।

মিনিট দশেক কথাবার্তার পর সুদর্শণ অমল সোমকে প্রস্তাব দিলেন, "মন্ডলপাড়া যদিও জলপাইগুড়ি সদর থানার জুরিসডিকশনে নয় তবু এস পি সাহেবকে বলে আমি অনুমতি আনিয়ে নিতে পারি। আপনি কি আমাদের সঙ্গে সেখানে যাবেন?"

অমল সোম নির্লিপ্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "কেন?"

"প্রথমে এই বিশ্বনাথকে অ্যারেস্ট করব, তারপর ওর দলটাকে।"

"কী কারণে?"

"সে কী? প্রথম কথা, ওরা ট্রেন ডাকাত; দ্বিতীয়ত,আপনার বাড়িতে এসে ভাঙচুর করেছে, আপনার কাজের লোককে মেরেছে!"

"ওরা যে ট্রেনডাকাত তার প্রমাণ কোথায়?"

"কিছু মনে করবেন না, আমি পুরনো পুলিশদের মতো অত্যাচারে বিশ্বাসী নই। কিন্তু তেমন হলে দেখেছি মারধোর করলে কাজ দেয়। পিঠে পড়লে বিশ্বনাথ পেটে কথা চেপে রাখতে পারবে না। আর ও যে এ বাড়িতে এসে হামলা করেছে তা আপনার কাজের লোকই বলতে পারবে।"

"আপনি ভুলে যাচ্ছেন, হাবু কথা বলতে পারে না।"

"ঠিক আছে, দেখে তো চিনতে পারবে। ও আইডেন্টিফাই করলেই হয়ে যাবে।"

"সেটাও ওর পক্ষে করা অসম্ভব।"

"কেন?" সুদর্শণ অবাক হয়ে গেলেন।

"কারণ ওরা সবাই মুখে কালো কাপড় বেঁধে এসেছিল। হাবু ওদের মুখ দেখতে পায়নি।" অমল সোম চোখ বন্ধ করলেন।

"ও। মিস্টার সোম, আপনি অভিজ্ঞ মানুষ। কিন্তু কিছু মনে করবেন না, আপনার কথাবার্তায় আমি কোনও উৎসাহ পাচ্ছি না। দলটাকে ধরার কোনও চেষ্টাই আপনি করছেন না।" সুদর্শণ বলতে বাধ্য হলেন।

"আমি আইন রক্ষক নই যে, কাউকে ধরার ক্ষমতা পাব। আপনি আমাকে সঙ্গে যেতে বলেছিলেন বলে আমি আমার ধারণা আপনাকে জানিয়েছিলাম। আপনার থানায়

ডায়েরি করা হয়েছে। আইন রক্ষক হিসেবে আপনি যা ভাল হয় তাই করুন। ওরা যা করছে তার জন্যে কড়া শাস্তি হওয়া দরকার। দেখবেন সেটা যেন হয়। আইনের ফাঁক গলে অল্পদিনের মধ্যে বেরিয়ে এলে ওরা আরও ডেসপারেট হয়ে যাবে। তাতে সাধারণ মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।''

এরপর সুদর্শণ বিদায় নিলেন। অর্জুন যখন তাঁকে গেটের বাইরে রাখা জিপের কাছে এগিয়ে দিল তখন তিনি নিচু গলায় বললেন, ''এত নিরুত্তাপ মানুষ আমি কখনও দেখিনি। বরফের চেয়ে ঠান্ডা।''

অর্জুনেরও অনেকটা সেই রকম মনে হচ্ছিল। এবার যেন অমল সোম একদম বদলে গিয়েছেন। ওঁর কথাবার্তা, অ্যাটিচুডের সঙ্গে আগের অমল সোমের কোনও মিল নেই। সে ফিরে এসে দেখল অমল সোম আবার চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। তাঁর হাতের আঙুলগুলো শুধু নড়ছে।

এই সময় হাবু চা নিয়ে এল। তিন কাপ চা, অর্থাৎ দারোগাবাবু যে চলে গেছেন এটা সে বুঝতে পারেনি। আগে হাবুর এরকম ভুল কখনও হত না। এখন চুল পেকেছে, একটু থপথপে হয়েছে। যে হাবুর শরীরে হাতির শক্তি ছিল সে এখন পড়ে পড়ে মার খেয়েছে ভাবতে অসুবিধে হয়।

অমল সোম চুপচাপ চা খেলেন। হাবু দাঁড়িয়ে ছিল একটু দূরে। তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ''দুপুরে খাব কী? বাজার আছে?''

হাবু শুনতে পায় না কিন্তু অমল সোমের ঠোঁট নাড়া দেখে বুঝতে পারে। আঙুল নেড়ে জিজ্ঞেস করল, কী খাবেন তিনি?

''পেঁপে সেদ্ধ, মাঝারি সাইজের, শসা আর দুধ।''

হাবু ঘাড় নেড়ে চলে যেতে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, ''আপনি কি ওখানে এই খান?''

''হ্যাঁ। রাতে রুটি আর সবজি, যদি পাওয়া যায়। গত রাতে তোমার বাড়িতে অনেকদিন পর অনিয়ম করেছি। পেঁপেটা নিয়মিত খাওয়া উচিত; ওর অনেক অনেক গুণ।''

অমল সোম এমনভাবে কথা বলছিলেন যে, বিশ্বনাথ-সংক্রান্ত সমস্যার কথা তিনি যেন ভুলে গেছেন। সে বলল, ''বিশ্বনাথের ব্যাপারটা কী করব? হাবুকে মেরে গেল, ছেড়ে দেবেন?''

অমল সোম উঠলেন। ব্যাগ থেকে কিছু জিনিস বের করে টেবিলে রাখতে রাখতে বললেন, ''পুলিশ তো জেনে গেল। ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব ওদের। আমি তো মন্ডলপাড়ায় গিয়ে বদলা নিতে পারি না। সেটা তো আইন সম্মত নয়।''

''কিন্তু ওকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া-!''

"তুলে দেব? কেন? পুলিশ কি ঠুঁটো জগন্নাথ! অন্য কেউ তাদের হয়ে কাজ না করে দিলে তারা কাজটা করতে পারে না?" কথা বলতে বলতে অমল সোম জামা খুললেন। গত রাতে ওঁকে খোলা গায়ে দেখেনি অর্জুন। আজ দেখে অবাক হল। অমল সোমের গলায় দুটো মালা, একটা পাথরের অন্যটা সম্ভবত রুদ্রাক্ষ। এর আগে কখনওই মানুষটাতে ওসব পরতে দেখেনি সে। তাই জিজ্ঞেস না করে পারল না, "মালাগুলো কেন পরেছেন?"

"এগুলো শরীর এবং মনের খুব উপকার করে।" গলা থেকে রুদ্রাক্ষের মালাটা খুলে এগিয়ে ধরলেন, "এগুলো একমুখী রুদ্রাক্ষ। সচরাচর পাওয়া যায় না। আবার যা পাওয়া যায় তার সঙ্গে এর বেশ পার্থক্য আছে। তুমি কোথাও এই জিনিস কিনতে পারবে না। অলকানন্দার জলে স্নান করতে গিয়ে এটাকে পেয়েছিলাম। অনেক সাধু এটাকে চেয়েছিলেন। আর চেয়েছিলেন বলেই আমি দেইনি। যাঁরা সাধু তাঁরা কেন চাইবেন? তাঁদের তো সব দিয়ে দেওয়ার কথা। তুমি ইচ্ছে করলে পরতে পারো।" অমল সোম বললেন।

"আমি পরে কী করব?" অর্জুন মৃদু আপত্তি জানাল।

"নাথিং জাস্ট ফিল দ্য ডিফারেন্স।" অর্জুনের হাতে মালাটা দিয়ে অমল সোম বললেন, "স্নানটান করে পরো, আর স্কিনের সঙ্গে যেন লেগে থাকে।"

রুদ্রাক্ষের মালাটাকে পকেটে ঢোকাল অর্জুন। এখন অমল সোম স্নান সেরে পুজোয় বসবেন। সেটা চলবে অনেকটা সময় ধরে। অতএব অপেক্ষা করার কোনও মানে হয় না।

।।৩।।

গলিতে ঢোকার মুখে বুড়িদির সঙ্গে দেখা। বুড়িদি তাদের বাড়ির জানালায় দাঁড়িয়ে ছিল। বুড়িদি জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ রে, তোর মা এখন নেই বলে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো? হলে বলবি।"

"থ্যাঙ্ক ইউ বুড়িদি।" বলতে বলতে অর্জুন লক্ষ্য করল বুড়িদির মুখে সেই আগের মতো কালচে ছোপ জমছে। এক সময় এটা এত ঘন হয়ে গিয়েছিল যে, ঘরের বাইরে বেরোত না বুড়িদি। খুঁটিমারি জঙ্গল থেকে একটা শেকড় নিয়ে এসে সে বুড়িদিকে দিয়েছিল। সেটা ঘষে দাগটা সম্পূর্ণ চলে গিয়েছিল। কথাটা সে তুলল।

বুড়িদি বলল, "দ্যাখ না, আবার ওরকম হচ্ছে। অনেক বছর বেশ ভাল ছিলাম। সেই শেকড়টাকে যে কোথায় পাওয়া যাবে কে জানে।" অর্জুন ঠিক করল যদি কখনও সে খুঁটিমারির জঙ্গলে যায় তা হলে বুড়িদির জন্যে আবার চেষ্টা করবে।

কাজের লোককে দায়িত্ব দিয়ে ওরা বেরিয়ে এসেছিল। বাড়ি ফিরে দেখল তার কাজ শেষ, রান্নাও হয়ে গেছে, সে চলে যাওয়ার জন্যে তৈরি। অর্জুন তাকে সন্ধেবেলায় আসতে নিষেধ করায় সে খুব খুশি হয়ে চলে গেল।

সকাল থেকে চা ছাড়া কিছুই খাওয়া হয়নি। আজকাল ওর খুব খিদে পায়। অর্জুন খানিকটা কেক নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। কিন্তু তার মন থেকে অস্বস্তিটা যাচ্ছিল না। বিশুনাথের ব্যাপারে অমল সোমের ব্যাপারে ওই নিস্পৃহ ভাব সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। বরং সুদর্শন ব্যানার্জিকে তার অনেকটা ঠিক বলে মনে হচ্ছিল। হাবুকে অমল সোম খুব স্নেহ করেন অথচ ওর ওই অবস্থা দেখেও তিনি শীতল আছেন। ধর্মভাব প্রবল হলে মানুষ কি এরকম নিরাসক্ত হয়ে যায়?

স্নান করবে বলে জামা খুলতেই রুদ্রাক্ষের কথা মনে পড়ল। সে পকেট থেকে মালাটা বের করে দেখতে লাগল। রুদ্রাক্ষগুলো এত টাইট হয়ে এ ওর গায়ে বসে আছে যে, কী দিয়ে মালা গাঁথা আছে তা বোঝা যাচ্ছে না। রুদ্রাক্ষগুলোকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল সে। ওরকম রুদ্রাক্ষ সে কখনও দেখেনি। মায়ের কাছে কয়েকটা আছে কিন্তু তার অনেক মুখ। সে শুনেছে রুদ্রাক্ষ পড়লে শরীরের নানান উপকার হয়। অর্জুন মালাটাকে নাড়তে নাড়তে অলসভাবে মাথা গলিয়ে গলায় নিয়ে এল। ঠিক বুকের ওপর মালাটা শেষ হচ্ছে।

হঠাৎ শরীর গরম হয়ে উঠল। জ্বালা নয় একটা তপ্ত হাওয়া যেন ঢেউয়ের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল সমস্ত শরীরে। অর্জুন ব্যাপারটা বুঝতে পারার আগেই মাটিতে পড়ে গেল সশব্দে। পড়ে স্থির হয়ে থাকল অনেকক্ষণ।

যখন সে সংবিৎ ফিরে পেল তখন মাথার ভেতরটা একদম ফাঁকা, শরীরে কোনও উত্তাপ নেই। ধীরে-ধীরে উঠে বসল সে। ব্যাপারটা কীরকম হল? হাই ভোল্টেজ ইলেকট্রিক তারে হাত পড়ে মানুষে যেভাবে ছিটকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায় তারও তো সেই অবস্থা হয়েছিল। সে রুদ্রাক্ষ মালায় হাত রাখল। একদম স্বাভাবিক, অথচ এই মালা পরার পরেই কান্ডটা ঘটেছিল। আর একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার হল, ওইভাবে মাটিতে পড়া স্বত্ত্বেও তার শরীরে কোনও আঘাত লাগেনি।

অর্জুনের মনে হল ঘটনাটা অমল সোমকে জানানো উচিত। রুদ্রাক্ষের এই মালার কোনও ক্ষমতা আছে কি না সেটা উনি বলতে পারবেন। সে আবার পোশাক বদলে সদর দরজায় তালা ঝুলিয়ে বাইরে পা বাড়াল। রামগোপালবাবু আসছেন। ওদের পাড়ার খুব মাতব্বর লোক। দিনবাজারে বিশাল কারবার। ভদ্রলোক যথেষ্ট কৃপণ এবং কাউকে সাহায্য করেন না বলে দুর্নাম আছে। অর্জুন দূর থেকেই বলল, "রামগোপালকাকা, ভাল আছেন?"

রামগোপালবাবু দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করে মুখ ভেটকে হাসলেন যার মানে দাঁড়ায়, এই চলে যাচ্ছে আর কি! কিন্তু অর্জুন স্পষ্ট শুনতে পেল, " এই শখের টিকটিকিটার মতলব কী? এমনি এমনি জিজ্ঞেস করছে বলে মনে হয় না।"

গলাটা অবিকল রামগোপালবাবুর। অথচ তিনি এখনও মুখ ভেটকে ঘাড় কাত করে আছেন। ওভাবে কথা বলা যায় না। "এ কী রে! এ আবার আমাকে ওভাবে দেখছে কেন!" রামগোপালবাবুর মাথা সোজা হল।

অর্জুন মুখে বলল, "এমনি জিজ্ঞেস করলাম। হ্যাঁ, আপনার কয়েকটা ভুল ধরিয়ে দিচ্ছি। প্রথম কথা, আমি টিকটিকি নই। টিকটিকি বলা হত গুপ্তচরদের। পুলিশের স্পাই হলে তাকে। দ্বিতীয়ত, আমার কোনও মতলব নেই, আমি এমনই জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আচ্ছা, চলি।"

রামগোপালবাবুর চোয়াল ঝুলে গেল। অর্জুন স্পষ্ট শুনতে পেল, "এইটুকুনি ছেলের কী লম্বা লম্বা বাত। তুই টিকটিকি কি না তাতে আমার কী লাভ!"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "কী যে বলেন রামগোপালকাকা।"

রামগোপালবাবু এবার মুখ খুললেন, "তুমি কি ছায়ার সঙ্গে কথা বলছ? তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আমি একটাও কথা বলিনি।"

অর্জুন হাসল, "তাহলে আমি ভুল শুনেছি।"

"কী শুনেছ তুমি?"

"আমি লম্বা লম্বা বাত বলি। আমি টিকটিকি কি না তাতে আপনার কী লাভ। নিশ্চয়ই ভুল শুনেছি। আচ্ছা-!" অর্জুন হাঁটতে হাঁটতে অনুভব করল যে যায়গায় রামগোপালবাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখান থেকে আর নড়তে পারছেন না।

রিকশা নিল অর্জুন। তার বাইকটা ঘরে বন্দি হয়ে রয়েছে। বন্দি করে গেছেন মা। সে বাইক চালায় বলে তাঁর খুব টেনশন হয়। তিনি বাইরে গেলে ছেলের যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয় সেই ভয়ে চাবি সরিয়ে রেখেছেন।

রিকশা চলছিল। হঠাৎ কানে এল, "এই বাবুটা খুব ভাল। মানুষের উপকার করে।"

অর্জুন চমকে চারপাশে তাকাল। তারপর সন্দিগ্ধ গলায় জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি কদমতলায় থাকো?"

"না বাবু। তিস্তার চরে আমার বাসা। আপনি এই প্রথম আমার রিকশায় উঠলেন।"

অবিকল এক গলা। অর্থাৎ সে রিকশাওয়ালার মনে মনে বলা কথা শুনেছে। এটা কী করে সম্ভব? রিকশা ততক্ষণে থানার মুখে পড়েছে। থানার গেটে একটা জিপ দাঁড়িয়ে আছে, জিপের পাশে সুদর্শনবাবু। সম্ভবত কারও জন্যে অপেক্ষা করছেন। অর্জুন রিকশাওয়ালাকে থামতে বলল।

সে এগিয়ে যেতে সুদর্শন বাবু বললেন, "এই যে মশাই, সুখবর দিচ্ছি। মূল আসামি ধরা পড়ে গেছে। ওকে জেরা করতে মন্ডলপাড়া যাচ্ছি। যাবেন নাকি?" অর্জুন কান পাতল। না, ভদ্রলোক মনে মনে অন্য কথা বোধহয় বলেননি। অন্তত সে কিছু শুনতে পেল না।

"ক'জন ধরা পড়েছে?"

"আপাতত বিশুনাথকে ধরেছে লোক্যাল থানা। কান টানলেই মাথা আসবে। মিস্টার সোম বলেছেন ওকে ধরলে আমরা প্রমাণ করতে পারব না। উনি যে ঠিক বলেননি সেটা ওঁকে জানাবেন।" সুদর্শনকে খুব খুশি দেখাল।

বিশুনাথকে দেখার ইচ্ছা হল। ট্রেন-ডাকাত নয়, এক রাতের মধ্যে মন্ডলপাড়া থেকে খবর পেয়ে জলপাইগুড়ি চলে এসে অমল সোমের বাড়িতে যে হামলা করেছে তার দর্শন পেতে আগ্রহী হল সে।

পুলিশের জিপে সে পৌঁছে গেল শহরতলির থানায়। সেখানকার পৌঢ় দারোগার সঙ্গে সুদর্শন অর্জুনের পরিচয় করিয়ে দিতেই লোক কৃতার্থ হয়ে হাসল কিন্তু অর্জুন স্পষ্ট শুনতে পেল, "এই গোয়েন্দাটা আবার এখানে কেন? যত্তসব ঝামেলা।"

অর্জুন কিছু বলল না। তার মজা লাগছিল।

দারোগাবাবুর ঘরে বসার পর ভদ্রলোক বললেন, "কিছুতেই মুখ খুলছে না। অনেক চেষ্টা করেছি। শেষ পর্যন্ত একটু রগড়ালাম কিন্তু কাজ হল না। আমার মনে হচ্ছে কোথাও ভুল হয়েছে। এ ছোকরা যে ট্রেন-ডাকাতি করে সে-কথা গ্রামের লোকেরও জানা নেই।"

অর্জুন জিজ্ঞেস না করে পারল না। "ওদের বাড়ি সার্চ করেছেন?"

দারোগা তাকালেন। অর্জুন শুনতে পেল, "ও ছোকরা আমাকে কী ভাবে?" দারোগা হাসলেন, "একটা সুচও বাকি রাখিনি। লুটের জিনিস পাওয়া গেলে তো হয়েই যেত।"

অর্জুন বলল, "কিন্তু বিশুনাথের বাবা বলেছিলেন, ও অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা করে এবং জিনিসপত্র একটা ঘরে রাখে। এই ব্যবসাটা তো ভাঁওতা।"

"হতে পারে। কিন্তু আমি সেই ঘরে কিছুই পাইনি। এখন এই অবস্থায় কোর্টে পাঠালে তো জাজ আমার বারোটা বাজিয়ে দেবে।"

সুদর্শন বললেন, "ছেলেটাকে এখানে আনুন তো!"

একজন সেপাইকে সেই হুকুম দিয়ে দারোগা বললেন, "এমনভাবে ওকে মারধোর করবেন না যা ও কোর্টকে দেখাতে পারে। ইতিমধ্যেই আমাকে ছোকরা মানবাধিকারের নাম দুবার শুনিয়েছে।"

সুদর্শন অবাক হলেন, "বাঃ। এ তো বেশ সেয়ানা বলে মনে হচ্ছে।" বিশ্বনাথকে নিয়ে এল দু'জন সেপাই। তার হাত খোলা কিন্তু কোমরে দড়ি বাঁধা রয়েছে। দেওয়ালের পাশে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

অর্জুন দেখল ছেলেটার বয়স একুশের বেশি নয়। রোগা, লম্বা, গয়ের রং শ্যামলা। পরনে পাজামা আর ফুলশার্ট। সুদর্শন বললেন, "দ্যাখো বিশ্বনাথ, তুমি ধরা পড়ে গেছ। ট্রেন ডাকাতের দলে তুমি ছিলে। এই সাহেবের কাছে সেটা যতই অস্বীকার করো কিন্তু যা সত্যি তা তো সব সময় সত্যি। আজ না হয় কাল তা প্রমাণিত হবে। তখন যা শাস্তি পাবে সেটার কথা ভাবো। তার চেয়ে যদি তুমি এখনই স্বীকার করে নাও আর যারা দলে ছিল তাদের নাম বলে দাও তা হলে আমরা তোমাকে ঠিক রাজসাক্ষী করে দেব। রাজসাক্ষী হলে তোমার শাস্তি কম হবে, নাও হতে পারে।

বিশ্বনাথ কোনও জবাব দিল না। একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল।

সুদর্শণ একটু অপেক্ষা করে বললেন, "আমি জানি তুমি তোমার সঙ্গীদের ভয় পাচ্ছ। ওরা তোমার ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু পুলিশ যদি তোমার পাশে থাকে তা হলে ওরা কী করতে পারে? উত্তর দাও।"

অর্জুন খানিকটা দূরে বসে শুনছিল। হঠাৎ মনে হল ছেলেটার কাছে যাওয়া দরকার। সে চেয়ার ছেড়ে কাছে এগিয়ে যেতেই শুনতে পেল, "আমি কিছু জানি না, কিছু করিনি, এর বেশি একটা কথাও বলব না।"

অর্জুন দাঁড়িয়ে গেল। বিশ্বনাথ ঠোঁট টিপে দাঁড়িয়ে আছে।

সে মৃদু গলায় ডাকল, "এই যে ভোলানাথ।"

বিশ্বনাথ তাকাল, জবাব দিল না। কিন্তু অর্জুন শুনল, "এ কেন ভোলানাথ বলল? যাই বলুক আমি কিছু জানি না।"

"ওর নাম বিশ্বনাথ, ভোলানাথ নয়।" দারোগাবাবু শুধরে ছিলেন।

এই সময় দু'জন লোক ঘরে চলে এল। একজন বলে উঠল, "এই তো, এই তো আমার ছেলে। হ্যাঁ রে, তোকে কেউ মারধোর করেনি তো?"

বিশ্বনাথ জবাব দিল না। দ্বিতীয় লোকটি বলল, "দারোগাবাবু, আমি ওর উকিল। আমার মক্কেলকে কোন চার্জে ধরে নিয়ে এসেছেন জানতে পারি?"

"কোর্টে গিয়ে জানবেন।"

"না। আপনাকেই বলতে হবে। কারণ আমার মক্কেলের কিরুদ্ধে কোনও স্পেসিফিক চার্জ আপনার নেই। কাল রাত্রে দুটো লোক ওদের গ্রামে গিয়ে রটিয়ে দিয়েছে যে ওরা ট্রেন ডাকাত, সঙ্গে সঙ্গে ওকে আপনারা অ্যারেস্ট করে নিয়ে এলেন?" উকিল ভদ্রলোক বেশ উত্তেজিত।

সুদর্শণ চুপচাপ শুনছিলেন। বললেন, "মাননীয় উকিলবাবু, ওর বিরুদ্ধে আর একটি অভিয়োগ আছে। গতরাতে দলবল নিয়ে ও আমার এলাকায় একটি বাড়িতে

হামলা চালিয়েছে। গৃহকর্তাকে না পেয়ে তার কাজের লোককে জখম করেছে। আর এইসব ঘটনার সাক্ষী আমাদের হাতে আছে। আপনি জামিন চাইলে কোর্টে আবেদন করতে পারেন।''

''কাল রাত্রে?''

''হ্যাঁ।''

''অদ্ভুত ব্যাপার।কাল সারারাত ও শিলিগুড়ি হাসপাতালে জেগে বসে ছিল। ওর বন্ধুর বাবা মৃত্যু শয্যায়। ও যে সেখানে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত ছিল তার সাক্ষী অনেকেই। ডাক্তার নার্সদের সঙ্গে কথা বললেই জানা যাবে বিশ্বনাথ সেখানে ছিল কি না। তা হলে নিশ্চয়ই ওর পক্ষে আপনার এলাকায় গিয়ে একই রাত্রে ওই সব কাজ করা সম্ভব নয়। তাই না?'' উকিল খুব দৃঢ়তার সঙ্গে প্রশ্ন করলেন।

স্থানীয় দারোগা বললেন, ''তা হলে তো ব্যাপারটা জটিল হয়ে গেল।''

''কোনও জটিল ব্যাপার নয়। একজন নিরপরাধ লোককে আপনারা জোর করে থানায় ধরে রাখতে পারেন না।'' উকিল জানালেন।

সুদর্শণ বললেন, ''পারি। সন্দেহজনক যে-কোনও মানুষকে আমরা থানায় ধরে আনতে পারি। আমরা ওকে আজই কোর্টে প্রোডিউস করে বিচারকের অনুমতি চাইব আরও কিছুদিন তদন্তের জন্যে পুলিশ হেপাজতে রাখতে। আপনারা বিরোধিতা করে যদি জামিন পেয়ে যান, ভাল কথা।''

''ওর বিরুদ্ধে এফ আই আর আছে?''

''আছে। জলপাইগুড়ির কোর্টে আসুন।''

স্থানীয় দারোগা বিশ্বনাথকে সুদর্শনের হাতে ছেড়ে দিয়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। হাতকড়ি পরিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে সেপাইদের সঙ্গে জিপে বসিয়ে ওকে জলপাইগুড়ি নিয়ে যাচ্ছিলেন সুদর্শন। তাঁর পাশে বসে ছিল অর্জুন। কেউ কোনও কথা বলছে না। ফাটাপুকুরের কাছে আসতেই অর্জুন স্পষ্ট শুনতে পেল, ''বদমাশটা নিশ্চয়ই খবর পেয়ে গেছে। ও যদি রেল গেটে এসে দাঁড়ায়-!''

অর্জুন চমকে তাকাতেই বিশ্বনাথের সঙ্গে চোখাচোখি হল। একটু বাদেই জিপ চলে এল রেলগেটের সামনে। এখন ট্রেনের সময় নয় বলে গেট খোলা। অর্জুন সুদর্শণকে বলল, ''জিপ থামাতে বলুন তো।''

ড্রাইভার জিপ থামাতেই অর্জুন নীচে নেমে দাঁড়াল। এখানে কেউ নেই। দূরে দোকানগুলোর সামনে কয়েকজন অলসভাবে রয়েছে। অর্জুন জিপের ভেতর মুখ ঢুকিয়ে বলল, ''হারাধন তো আসেনি। খবর পায়নি বোধ হয়।''

শোনামাত্র বিশ্বনাথ যে অবাক হয়েছে তা বোঝা গেল। সুদর্শণ জিজ্ঞেস করলেন, ''কে হারাধন?''

''বিশ্বনাথকে জিজ্ঞেস করুন।''

বিশ্বনাথ মুখ ফিরিয়ে নিতেই অর্জুন শুনতে পেল, ''এই লোকটা আমার মনের কথা জানল কী করে? ম্যাজিক জানে নাকি?''

''বিশ্বনাথ, হারাধন কে?'' সুদর্শণ গম্ভীর।

''আমি জানি না।''

পুলিশের জিপকে দাঁড়াতে দেখে দু-তিনজন কৌতূহলী এগিয়ে এসেছিল। অর্জুন তাদের সামনে গিয়ে বলল, ''ভাই, একটু হারাধনকে খবর দেবেন। খুব দরকার।''

একজন বলল, ''হারু তো ওই চায়ের দোকানের সামনে বসে আছে।''

অর্জুন চেঁচিয়ে ডাকল, ''সুদর্শনবাবু, চলে আসুন।''

সুদর্শন গাড়ি থেকে নেমে কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, ''এই বদমাশ লোকটাকে আপনি কী করে জোগাড় করলেন?''

''পরে বলব। একটু সাবধানে চলুন। আপনার সঙ্গে অস্ত্র আছে তো?''

''ওটা না থাকলে অস্বস্তি হয়।''

চায়ের দোকানের সামনে পৌঁছে ওরা দেখল, গোটা তিনেক ছেলে গল্প করছে। কাউকে দেখতে অপরাধীর মতো নয়। সুদর্শণ সাদা পোশাকে ছিলেন। ওরা কথা থামিয়ে তাকাল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, ''হারাধন কে?''

''আমি, কেন?''

''তোমার বন্ধু বিশ্বনাথ গাড়িতে বসে আছে, ডাকছে।''

''কোন বিশ্বনাথ?''

''মন্ডলপাড়ার বিশ্বনাথ।''

''আমি চিনি না। ওই নামে আমার কোনও বন্ধু নেই।''

''এখানে তুমি ছাড়া আর কেউ আছে যার নাম হারাধন?''

''খোঁজ নিন, আমি জানি না।''

ওর পাশের ছেলেটি বলল, ''আর কোনও হারাধন এখানে নেই।''

''না থাকলে আমি কী করব? আমি বিশ্বনাথ বলে কাউকে চিনি না।''

সুদর্শন অর্জুনের দিকে তাকালেন। অর্জুন আরও দু'পা এগিয়ে যেতেই শুনতে পেল, ''এরা নিশ্চয়ই পুলিশ। ভোলানাথ নিশ্চয়ই ধরা পড়ে নাম বলে দিয়েছে। কী করে পালানো যায়।''

অর্জুন বলল, ''ভোলানাথের নামই তো বিশ্বনাথ, তাই না?''

শোনামাত্র ছেলেটির চোয়াল ঝুলে গেল।

অর্জুন বলল, ''বুঝতেই পারছ আমাদের কোনও ভুল হয়নি। জোর জবরদস্তি করলে সবাই জেনে যাবে। তার চেয়ে ভদ্রভাবে চলো, ওই জিপে তোমার বন্ধু বসে আছে। আমরা কোনও ঝামেলা করতে চাই না।''

ছেলেটি বাধ্য হল উঠে দাঁড়াতে। সুদর্শন বললেন, ''দৌড়ে পালাবার চেষ্টা কোরো না। পেছন থেকে গুলি ছুড়লে মাথায় লাগতে পারে।'' বলতে বলতে তিনি অস্ত্রটা বের করে দেখালেন।

একটা কথাও না বলে হারাধন রাস্তাটা হেঁটে এসে জিপে উঠতেই সুদর্শনের নির্দেশে সেপাইরা তাকে হাতকড়া পরিয়ে দিল। বিশুনাথের পাশে বসেই হারাধন চাপা নিষ্ঠুর গলায় বলে উঠল, ''তুই আমাকে ধরিয়ে দিলি, এর শাস্তি তুই কল্পনাও করতে পারবি না।''

ইতিমধ্যে পিলপিল করে মানুষ ছুটে আসছে। স্থানীয় ছেলে হারাধনকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে এই খবরটা দ্রুত চাউর হয়ে যাচ্ছে। অর্জুন বলল, ''হারাধনের বাড়িতে চলুন, ডাকাতির জিনিসগুলো ওখানে থাকলেও থাকতে পারে।''

মাথা নেড়ে ড্রাইভারকে সোজা চালাতে বলে সুদর্শন গলা নামালেন, ''খেপেছেন? এই ক্রাউড পেছন পেছন যাবে। কেউ যদি খেপিয়ে দেয় তা হলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের ছিনিয়ে নেবে, আমার সঙ্গে ফোর্স নেই।''

ওদিকে পেছনের সিটে বন্দি অবস্থায় হারাধন সমানে গালাগালি করছে বিশুনাথকে। শেষ পর্যন্ত বিশুনাথ বলল, ''আমি তোকে ধরিয়ে দিইনি।''

''মিথ্যে কথা। তুই না বললে এখানে গাড়ি থামল কেন? ওরা আমার খোঁজে চায়ের দোকানে কেন গেল?''

''আমি মুখে কিছু বলিনি। এদের জিজ্ঞেস কর!''

পাশে বসা একজন সেপাই হাসল, ''না। এ কিছু বলেনি। কথাই বলেনি।''

''না বললে এরা জানল কী করে?''

বিশুনাথ করুণ গলায় বলল, ''জানি না। আমি মনে মনে বলেছিলাম অথচ উনি শুনে ফেললেন?''

হারাধন রেগে গিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বলল না। অর্জুন শুনতে পেল, ''কথাটা ঠিক। আমি মনে মনে ভোলানাথকে বলেছিলাম অথচ এই লোকটা শুনতে পেয়েছিল।'' সে একদম চুপ হয়ে যাওয়ার আগে ফিসফিস করে বিশুনাথকে বলল, ''শোন, তুই কোনও কথা মনে মনে ভাববি না।''

জলপাইগুড়ি সদর থানায় না আসা পর্যন্ত কোনও কথাবার্তা হল না। সেকেন্ড অফিসারকে ওদের কাগজপত্র তৈরি করতে বলে সুদর্শন অর্জুনের সঙ্গে আলাদা বসলেন, ''কী ব্যাপার বলুন তো? অনেকক্ষণ থেকে আমি কৌতূহল চেপে আছি।''

''কী ব্যাপারে বলুন?''

''আপনি রেলগেটে গাড়ি থামাতে বললেন, হারাধনের নামও সহজে উচ্চারণ করলেন। অথচ আমি নিশ্চিত এ ব্যাপারে আপনার আগে কিছু জানা ছিল না।''

"আপনি ঠিকই বলেছেন। মানুষ যা চিন্তা করে তা কেউ কেউ পড়তে বা শুনতে পান, এটা জানেন তো?"

"শুনেছি। থট রিডিং গোছের কিছু।"

"ওই ধরে নিন।" অর্জুন হাসল, "এই যেমন আপনি জিপে বসে এই কথাটা অনেকবার ভেবেছেন। আমি ম্যাজিক দেখাচ্ছি বলে মন্তব্য করেছেন।"

"অ্যাঁ? সেটাই আপনি শুনতে পেয়েছেন।" সুদর্শন অবাক।

অর্জুন বলল, "কিন্তু এটা ম্যাজিক নয়।" অর্জুন উঠতে চাইল।

"দাঁড়ান, দাঁড়ান আমাকে শিখিয়ে দেবেন?"

"এটা কাউকে শেখানো যায় না। গুরু দয়া করলে হয়ে যায়।"

"গুরু? আপনার গুরু কে?"

"অমল সোম।"

"যাচ্চলে! আপনি বুঝতে পারছেন না অর্জুন, এই ব্যাপারটা আমাদের ডিপার্টমেন্টে কি চমৎকার কাজে আসবে। অনেক ঘুঘু অপরাধীকে মারধোর দিয়েও মুখ খোলাতে পারি না। স্রেফ প্রমানের অভাবে তারা পার পেয়ে যায়। ওদের মনের কথা পড়তে পারলে শাস্তি দিতে কোনও সমস্যা হবে না।" আন্তরিক গলায় বললেন সুদর্শন।

"আমি অমলদাকে আপনার প্রস্তাবের কথা বলব।"

"প্লিজ বলুন। দরকার হলে এস পি সাহেবকে নিয়ে ওঁর বাড়িতে যেতে পারি আমি। এই আবিষ্কারের কথা জানাজানি হলে সমস্ত পৃথিবীতে হইচই পড়ে যাবে।" সুদর্শন যেন স্বপ্ন দেখছিলেন।

"কিন্তু ওদের আজ কোর্টে তুলবেন যখন, তখন চার্জশিট দেবেন না?"

"সময় চাইব। আগে হারাধনকে রগড়াই, যদি খবর বের হয়। আমি বুঝতে পারছি এরাই ট্রেনে ডাকাতি করেছে কিন্তু এখনও হাতে কোনও প্রমাণ নেই। গাড়িতে উঠে বিশ্বনাথকে দেখে হারাধন যেভাবে রি-অ্যাক্ট করল তাতেই স্পষ্ট, ওরা একটা অপরাধ করেছে।"

"কিন্তু শুধু এই কথাগুলো কি কোর্টে বিশ্বাস করবে?"

"না।"

"অমলদার বাড়িতে হামলা করে হাবুকে মারধোর করার অপরাধে বিশ্বনাথকে আপনি ধরে রাখতে পারবেন না। ওর উকিল ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে গতরাতে ও কোথায় ছিল।"

"হ্যাঁ। নিশ্চয়ই সাক্ষী রাখবে।"

"তা হলে? হামলা করল কে? বিশ্বনাথ নিজে না এসে ওর বন্ধুদের পাঠিয়েছিল? সেই বন্ধুদের মধ্যে হারাধন ছিল? এসব প্রশ্নের উত্তর জানা দরকার।" অর্জুন এবার উঠে দাঁড়াল।

সুদর্শন মাথা নাড়লেন, "আমার মনে হচ্ছে বিশ্বনাথ কাল রাতে এই শহরে আসেনি সে যখন শুনেছে ট্রেন ডাকাতির ব্যাপারে মিস্টার সোম তার খোঁজে গ্রামে গিয়েছিলেন, ওর বাবার সঙ্গে কথা বলে নিজের ঠিকানা দিয়ে এসেছেন, তখন সে যদি হামলা করতে আসে তাহলে পুলিশ আগে তাকেই সন্দেহ করবে। ও চলে গেছে শিলিগুড়িতে। সেখানে থাকার অজুহাত খাড়া করেছে এবং বন্ধুদের পাঠিয়েছে।"

কথাগুলো শুনতে শুনতে হঠাৎ অর্জুনের মনে হল ঘটনাটা এইরকম সহজভাবে ঘটেনি। বিশ্বনাথের বাড়ি এবং গ্রাম সে দেখেছে। বিশ্বনাথকেও। একটু রোগা হলেও ওর শরীরে শক্তি আছে। পড়াশুনো বেশি করেনি। কিন্তু এ-ধরনের অপরাধ অর্গানাইজ করার মতো বুদ্ধি এবং দক্ষতা ওর কিছুতেই থাকতে পারে না।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনারা ওকে কখন কোর্টে তুলবেন?"

"সেকেন্ড হাফে।"

"কোন চার্জে?"

"ট্রেনডাকাতি এবং বাড়িতে হামলা। দুটো জুড়ে দেব।"

"আমি একবার বিশ্বনাথের সঙ্গে আলাদা কথা বলতে পারি?"

"নিশ্চয়ই।" সুদর্শন হুকুম দিলেন বিশ্চনাথকে আনার জন্যে।

অর্জুন বলল, "ওদের কি একসঙ্গে রেখেছেন?"

"না। একসঙ্গে থাকলে তো পরামর্শ করবে।"

বিশ্বনাথকে নিয়ে আসা হল। তাকে চেয়ারে বসতে বললে যে ইতস্তত করে বসল। অর্জুন বলল, "বিশ্বনাথ, গতকাল আমি আর আমার দাদা তোমার বাড়িতে গিয়েছিলাম। যাওয়ার আগে শুনলাম গ্রামের লোকজন তোমার বাবার ওপর খুব অসন্তুষ্ট। ব্যাপারটার কারণ কী বলো তো?"

"বাবাকে জিজ্ঞেস করলে পারতেন।"

"আমরা তোমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি রাত সাড়ে ন'টার পরে।তুমি নিশ্চয়ই তারও পরে বাড়িতে ফিরে আমাদের কথা শুনেছ। তাই তো?"

অর্জুন শুনতে পেল, বিশ্বনাথ ভাবছে, আমি কোনও জবাব দেব না।

"তুমি ভাবলে কোনও জবাব দেবে না, তাই তো?"

বিশ্বনাথ চোখ তুলে তাকিয়ে ভাবল, "এই লোকটা আমার মন পড়তে পারছে কী করে? যা ভাবলাম তা জেনে ফেলছে? আমি তা হলে আর ভাবব না বললেই পারা যায় নাকি? যদি হারাধন মুখ খোলে!"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "ঠিক কথা। হারাধন মুখ খুললে তুমি খুব বিপদে পড়ে যাবে। তার চেয়ে আমরা তোমার সঙ্গে কাল রাত্রে গ্রামে ফিরে যাই। গিয়ে বৈদ্যনাথবাবুর সামনে দাঁড়াতেই তিনি তোমাকে কী বলতে পারেন? এখন টাকাপয়সা রোজগার করছ আর তোমার বাবা যেহেতু ওই বস্তুটিকে খুব ভালবাসেন তাই তোমাকে বকাঝকা অথবা

মারধোর না করে সতর্ক করেন। বলেন তোমার স্টোররুমে যা সাপ্লাইয়ের জিনিস ছিলসব তিনি বের করে আলাদা রেখে দিয়েছেন। কিন্তু তোমাকে তখনই জলপাইগুড়ির হাকিমপাড়ায় অমল সোমের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে বললেন। ঠিক বললাম?''

ঠোঁট টিপে থাকল বিশ্বনাথ। আর মনে মনে বলল, ''আমি কোনও কিছু ভাবব না। যা বলার বলে যাক।''

''তারপর তুমি বাড়ি লেকে বেরিয়ে দলবল জুটিয়ে একটাগাড়ি ম্যানেজ করে চলে এলে জলপাইগুড়িতে। ঠিকানা খুঁজে অমল সোমর বাড়িতে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাউকে না পেয়ে ওঁর কালা বোবা চাকরটাকে মারলে। ঠিক?''

সজোরে মাথা নাড়ল বিশ্বনাথ, ''না, আমি জলপাইগুড়িতে যাইনি।''

''তা হলে শিলিগুড়িতে চলে গিয়েছিল।''

''হ্যাঁ।''

''কিন্তু শিলিগুড়িতে নেমেই তুমি হাসপাতালে যাওনি। কারণ সেখানে তোমার কোনও বন্ধুর বাবা অসুস্থ হয়ে শুয়ে আছেন এ কথা তুমি জানতে না। তুমি কি কাউকে ফোন করে ঘটনাটা বলেছিলে, না নিজে গিয়েছিলে?''

''আমি হাসপাতালে গিয়েছিলাম।''

''কেন? সেখানে তো তোমার যাওয়ার কথা নয়। যদি তেমন কেউ অসুস্থ থাকত যার জন্যে রাত জাগা যায় তা হলে তুমি সন্ধে থেকেই সেখানে থাকতে, মন্ডলপাড়ায় ফিরে যেতে না।''

অর্জুন শুনল বিশ্বনাথ ভাবছে, ''কথাটা ঠিক বলছে। মহামুশকিল হয়ে গেল। লোকটা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কথার চাপ দিচ্ছে।''

অর্জুন হাসল, ''তোমার তাই মনে হচ্ছে? আমি কথার চাপ দিচ্ছি?''

বিশ্বনাথ সোজা হয়ে বসল, ''আপনি কে?''

''আমার নাম অর্জুন।''

''আপনি এইভাবে মনের কথা বলেন কী করে?''

''কোথায় আর বললাম? তুমি তো মনে মনে ভাবছ না কাল রাত্রে শিলিগুড়িতে পৌঁছে ঠিক কী করেছিলে।''

''আমি হাসপাতালে ছিলাম।''

''হ্যাঁ। সেটা আমিও বিশ্বাস করি। তুমি জলপাইগুড়িতে যাওনি।''

অর্জুন শুনল বিশ্বনাথ ভাবছে, ''সত্যি কথা বলছে কিনা কে জানে!''

বিশ্বনাথকে ফেরত পাঠিয়ে সে সুদর্শনকে বলল হারাধনকে আনাতে। সুদর্শন সেই আদেশ দিয়ে বলল ''আপনি তো আমার কেস খারাপ করে দিচ্ছেন অর্জুন। আপনি বিশ্বাস করেন বিশ্বনাথ জলপাইগুড়িতে আসেনি?''

''হ্যাঁ।''

"তা হলে ওর বিরুদ্ধে হামলার মামলা টিকবে না।"

" না। কারণ কোনও বুদ্ধুও দল নিয়ে আসবে না হামলা করতে যখন সে জানে তার গোপন খবর লোকটার জানা।কিন্তু হামলা হয়েছিল তার কারণ ট্রেন ডাকাতির একমাত্র সক্রিয় সাক্ষীকে সরিয়ে দেওয়া দরকার বলে ওরা মনে করেছিল।" অর্জুন কথা শেষ করতেই হারাধনকে নিয়ে সেপাই ঢুকল। তাকে আদর করে বসিয়ে অর্জুন বলল, " এখন তুমি কী করবে তা তোমাকেই ঠিক করতে হবে হারাধন।"

"মানে?"

"বিশ্বনাথ বলে গেছে সে জলপাইগুড়িতে হামলা করতে আসেনি। ওর বাবার কাছে গত রাত্রে মন্ডলপাড়ায় ফিরে যখন জানতে পারল ট্রেনডাকাতির দু'জন সাক্ষী বাড়িতে খোঁজ করতে এসেছিল তখনই ও গ্রাম ছেড়ে শিলিগুড়িতে ফিরে যায়। শিলিগুড়িতে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করে। তুমি তখন ওখানেই ছিলে। আজ সকালে বাড়ি ফেরার প্ল্যান ছিল। খবরটা শুনে তুমিই বন্ধুদের জোগাড় করে একটা গাড়ি নিয়ে মাঝ রাতে জলপাইগুড়িতে যাও সাক্ষীকে সরিয়ে দিতে। সাক্ষীকে না পেয়ে কাজের লোককে মারধোর করে ফেরার পথে রেলগেটের কাছে নেমে গিয়েছ, কারণ তার কাছেই তোমার বাড়ি।" অর্জুন হাসল।

"মিথ্যে কথা।" মাথা নাড়াল হারাধন।

"কোনটা মিথ্যে?"

"আমি কিছু জানি না।"

"তুমি যে কাল সারারাত বাড়ি ছিলে না, ভোরে ফিরেছ, এ খবর এতক্ষণ আমরা পেয়ে গেছি। এটাও মিথ্যে?"

হারাধন চুপ করে রইল। কিন্তু সে কিছু ভাবছে না।

"চুপ করে থাকলে তোমার উপকার হবে না। কাল রাত্রে শিলিগুড়িতে বিশ্বনাথ তোমার সঙ্গে দেখা করেনি?"

"না।"

"তুমি তা হলে এ-ব্যাপারে কিছু জানো না?"

"না।"

"গতকাল ট্রেনে ডাকাতির একটু আগে বিশ্বনাথকে ভোলানাথ বলে ডাকোনি? যার জন্যে বিশ্বনাথ তোমার ওপর রেগে গিয়েছিল!"

হারাধন এমনভাবে চমকে উঠল যে, সুদর্শন পর্যন্ত হেসে উঠলেন, "আর লুকিয়ে লাভ নেই ভাই। বুঝতেই পারছ বিশ্বনাথ একটু আগে সব কথা ফাঁস করে গেছে।"

হারাধন মাথা নিচু করল। বোঝাই যাচ্ছিল ওর মনে ঝড় বইছে।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কাল ট্রেনে তোমরা ক'জন দলে ছিলে?"

"আটজন।" মিনমিনে গলায় জবাব এল।

"আটজনই কি বন্ধু?"

"না। কাজ করতে গিয়ে আলাপ হয়েছিল।"

"তুমি রেলগেট, বিশ্বনাথ মন্ডলপাড়ার, আর বাকিরা?"

"কেউ বেলাকোবা, কেউ আমবাড়ি ফালাকাটার, বাকিরা শিলিগুড়ির।"

"এর আগে কতবার ট্রেনডাকাতিতে ছিলে তোমরা?"

"আমি সেকেন্ড টাইম।"

"কী করে এদের সঙ্গে যোগাযোগ হল?"

"সিনেমা দেখতে গিয়ে।"

"কী রকম?"

"শিলিগুড়ির মেঘদূত সিনেমায় মিঠুনের বই এসেছিল। অ্যাডভান্স হাউসফুল ছিল, কারেন্ট টিকিটের লাইন ব্ল্যাকাররা ম্যানেজ করে নিচ্ছিল বলে আমার সঙ্গে ঝামেলা হয়। আমি দু'জনকে খুব মেরেছিলাম। তখন একজন এসে মিটিয়ে দিয়ে টিকিট দিল। সিনেমা দেখে বেরনোর সময় লোকটা আমাকে ডেকে নিয়ে গেল একটা রেস্টুরেন্টে। চা, কাটলেট খাইয়ে আমার খবর নিল। আমি বেকার শুনে কাজ পাইয়ে দেবে বলে। পরদিন লোকটা রেলগেটে এসে আমার বাড়িতে যায়। সব দেখেশুনে বলে পরদিন শিলিগুড়িতে যেতে।"

"শিলিগুড়ির কোথায়?"

হারাধন তাকাল, "আমি মরে যাব। ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। বস বলে দিয়েছে কেউ পুলিশের কাছে মুখ খুললে তার জান নিয়ে নেওয়া হবে।"

"কেউ জানবে না। বস জানবে কী করে?"

"এই সব কথা আপনারা কোর্টে বললেই বস জেনে যাবে।"

"তোমাকে কথা দিচ্ছি কোর্টে কিছু বলব না আমরা।"

"আপনি পুলিশ?"

"না। আমি পুলিশ নই। উনি এখানকার চার্জে আছেন এবং আমি জানি উনি আমার কথা রাখবেন।"

হারাধন মাটির দিকে তাকাল। অর্জুন শুনতে পেল, "বলেই ফেলেছি যখন তখন আর চেপে গিয়ে লাভ কী! ওরা যদি কোর্টে কিছু না বলে তা হলে আমিও বলব আমি কিছু বলিনি।"

অর্জুন হাসল, "ঠিক কথা। তুমি ঠিক ভাবছ ভাই।"

হারাধন হাউমাউ করে উঠল, "আচ্ছা, আমি যা ভাবছি তা আপনি বুঝতে পারছেন কী করে বলুন তো?"

"ভগবানের আশীর্বাদে। হ্যাঁ, বাকিটা বলো।"

হারাধন কয়েকবার নিশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, "ওই মেঘদূত সিনেমার সামনে।"

"তারপর?"

"সেখানে ওই লোকটা ছিল।"

"কী নাম লোকটার?"

"মানাভাই।"

"বাঙালি?"

"জানি না। বাংলা, নেপালি, হিন্দি, এমন কি ইংরেজিতেও কথা বলে।"

"বেশ। মানাভাই তোমাকে কি বলল?"

"বলল, আমার গায়ে জোর আছে, সাহসও আছে, আমি কেন আরও বেশি রোজগারের ধান্দায় না গিয়ে চাকরির চেষ্টা করছি। ওর বস নাকি আমাদের মতো বেকার ছেলেদের উপকার করার জন্যে একটা ক্লাব করেছেন। আমি ইচ্ছে করলে সেই ক্লাবের মেম্বার হতে পারি।"

"তারপর?"

"মানাভাই আমাকে নিয়ে গেল সেবক রোডের একটা বাড়িতে। বাড়িটায় ঢোকার গেটের ওপর একটা সাইনবোর্ড ছিল। তাতে চায়ের ব্যবসা করার কথা লেখা ছিল। সামনে অনেক চায়ের বাক্স ছিল। পেছনের দরজা দিয়ে যে ঘরে মানাভাই আমাকে নিয়ে গেল সেখানে ছ'জন ছেলে বসে ছিল।"

"বিশ্বনাথ তাদের মধ্যে ছিল?"

"না। ও পরে এসেছিল।"

"তারপর কী হল?"

"ওখানে একজন মাস্টারমশাই এলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আমরা ভাগ্যের হাতে মার খেয়ে গরিব হয়ে বেঁচে থাকতে চাই, না কি ভাগ্যকে জয় করতে চাই।' প্রথমটা চাইলে এখনই চলে যেতে পারি। সবাই একসঙ্গে বললাম, ভাগ্যকে জয় করতে চাই। তিনি খুশি হলেন। বললেন, 'ভাগ্যকে জয় করার অনেক পথ আছে। সাহস, বুদ্ধি এবং শক্তিকে এক করতে হবে। এই পৃথিবীতে কেউ মুখ দেখে হাতে কিছু তুলে দেয় না। ওই তিনটি গুণ এক করে সেটা আদায় করে নিতে হয়। পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছে যাদের কিছু নেই। আবার কিছু মানুষ আছে যাদের প্রচুর আছে। আমরা চাইলে ওই প্রচুর থাকা মানুষদের কাছ থেকে কিছু আদায় করে নিতে পারি। কিন্তু ওই আদায় করতে গেলে সহজে সেটা দেবে না। তখন জোর খাটাতে হবে।

"একজন জিজ্ঞেস করল, জোর করে আদায় করতে গেলে পুলিশ ধরবে। কিন্তু মাস্টারমশাই হেসে বললেন, 'তোমরা সেখানে এই কাজটা করবে যেখানে পুলিশ থাকবে না। খবর পেয়ে পুলিশ আসার আগেই তোমরা অনেক দূরে চলে আসবে।

আমরা চাই না এইসব করার সময় ওদের কেউ আহত হোক। কিন্তু তেমন প্রয়োজন হলে আর কী করা যাবে।' প্রথমদিন ওই পর্যন্ত হয়েছিল। আমাদের একটা কাগজে সই করতে হয়েছিল। একজন ক্যামেরাম্যান এসে প্রত্যেকের ছবি তুলে নিয়ে গিয়েছিল। বলা হল, আজ থেকে এই ক্লাবের কথা যে বাইরে বলবে সে বিশ্বাসঘাতক এবং বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি মৃত্যু।

"তারপর একটু একটু করে আমাদের শেখানো হল কী করে কোন ট্রেনে ডাকাতি করতে হবে। কিভাবে হাইওয়েতে বাস আটকে ডাকাতি করতে হবে। ট্রেন বা লংরুটের বাসযাত্রীরা নিজেদের খুব অসহায় ভাবে। ডাকাত দেখলে তেমন প্রতিরোধ করে না। আর রিভলভার দেখলে তো কথাই নেই। আমি বা বিশ্বনাথ বাস ডাকাতি করিনি, ট্রেনে করেছি। প্রথমবার কেউ বাধা দেয়নি। দ্বিতীয়বারে একটা লোক রিভলভার দেখিয়েছিল বলে একটু মুশকিল হয়েছিল। তবু কেউ ধরা পড়িনি।"

"তারপর?"

"রাত্রে বিশ্বনাথ বসকে জানিয়েছিল দুটো লোক মন্ডলপাড়ায় তাদের বাড়িতে গিয়ে ডাকাতির কথা বলে জলপাইগুড়িতে যেতে বলেছে, বস ঠিক করল বিশ্বনাথ যাবে না। সে হাসপাতালে থাকবে। সেখানে সত্যিই একজন অসুস্থ হয়ে শুয়ে আছে, আমাদের পাঠাল গাড়ি দিয়ে লোক দুটোকে শেষ করে দিতে। আমরা ভোর পাঁচটায় পৌঁছে হাকিমপাড়ায় গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। একটা লোক হাফপ্যান্ট পরে হেঁটে এলে তাকে জিজ্ঞেস করে বাড়িটায় পৌঁছে গেলাম। কিন্তু লোক দুটোর কপাল ভাল বলে ওরা রাত্রে বাড়িতে ফেরেনি। ওদের চাকরটা জবাব দিচ্ছিল না বলে বেশ ধোলাই খেয়েছে। শেষ পর্যন্ত ওরা আমাকে রেলগেটে নামিয়ে দিয়ে শিলিগুড়ি চলে গেল।"

অর্জুন সুদর্শনের দিকে তাকাল, "এ সত্যি কথা বলেছে। তোমাকে বলি হারাধন, যে দু'জনকে তোমরা খুন করতে গিয়েছিলে তার একজন হলাম আমি। আর যে চাকরটাকে মেরেছ সে বোবা এবং কালা, বেচারা কথা বলতে পারে না।"

হারাধন মুখ নিচু করল। সুদর্শন ওকে ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, "এ ছোকরা যদি সত্যি কথা বলে থাকে তা হলে আর দেরি করার কোনও মানে হয় না। এখনই শিলিগুড়িতে খবর পাঠাই। ওই চায়ের অফিসে গিয়ে সবক'টাকে হাতেনাতে ধরে ফেলুক। আমার মনে হচ্ছে ওটাই ডাকাতির জিনিস রাখার গুদাম।"

"আমার তা মনে হয় না।" অর্জুন মাথা নাড়াল।

"কেন?"

"ওরা অত বোকা নয়। এখন পুলিশ গেলে কাউকে খুঁজে পাবে না। ওরা ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছে, বিশ্বনাথ এবং হারাধনকে পুলিশ ধরেছে। নিশ্চয়ই সতর্ক থাকবে এখন।"

''তা অবশ্য। কিন্তু এই বস লোকটা কে?''

''যে মানাভাই বা মাস্টার মশাইকে চালায়। এখন তো মনে হচ্ছে এই অঞ্চলের সমস্ত ট্রেন-বাস ডাকাতি এই লোকটির জন্যে হচ্ছে।''

অর্জুন কথা শেষ করা মাত্র সেকেন্ড অফিসার এসে দাঁড়ালেন, ''স্যার, এই দুটোকে কোর্টে নিয়ে যাব?''

''যাবেন। কিন্তু কি কেস দিয়েছেন?''

''ট্রেন ডাকাতি, খুনের জন্যে বাড়িতে হামলা। এটা না দিলে হয়তো জামিন পেয়ে যাবে।''

সুদর্শন কিছু বলার আগে অর্জুন বলল, '' একটি অনুরোধ করব?''

সুদর্শন মাথা নাড়ালেন।

''ওদের দু'জনের বিরুদ্ধে শুধু ট্রেন ডাকাতির অভিযোগ রাখুন।''

''শুধু ট্রেন ডাকাতি?'' সেকেন্ড অফিসার মাথা নাড়লেন, ''না, তা হলে বিচারক জিজ্ঞেস করবেন প্রাথমিক কোনও প্রমাণ আছে কিনা? তেমন বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি না দেখালে ওরা ছাড়া পেয়ে যাবে।''

''যাক না।'' অর্জুন বলল।

''কী বলছেন অর্জুন?'' প্রতিবাদ করলেন সুদর্শন।

''ভেবে দেখুন, বিশ্বনাথ এবং হারাধনকে আপনারা যখন ইচ্ছে তখনই ধরতে পারবেন, যদি ওরা পালিয়ে না যায়। পালিয়ে গেলেও ওরা ওদের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বেশিদিন থাকতে পরবে না। ধরা পড়বেই। কিন্তু আপনাদের কী লাভ হবে? ওদের দল, বিশেষ করে ওদের বস বিশ্বাস করবে ওরা মুখ না খোলায় পুলিশ কেস সাজাতে পারেনি। ফলে লোকটা আবার ডাকাতির মতলব আঁটবে। তখন ওদের হাতে নাতে ধরার সুযোগ পাচ্ছেন আপনারা। এদের শাস্তি দিয়ে কী লাভ, যতক্ষণ না ওদের বসকে ধরতে পারছেন। বরং যদি সম্ভব হয় কোর্ট থেকে ছাড়া পেয়ে ওরা কোথায় যায় তা কাউকে দিয়ে ফলো করিয়ে দেখুন।'' অর্জুন বলল।

সুদর্শন একটু চিন্তা করে বললেন, ''বেশ ঝুঁকি নেওয়া হয়ে যাচ্ছে কিন্তু চুনোপুঁটি ধরে কোনও লাভ নেই। তুমি আর একবার বদমাশটাকে নিয়ে এসো।'' সেকেন্ড অফিসার সমর্থন করতে পারছিলেন না কিন্তু বড়বাবুর আদেশ মানতে তিনি বাধ্য।

একটু পরেই হারাধনকে একজন সেপাই পৌঁছে দিয়ে গেল।

সুদর্শন বললেন, ''হারাধনবাবু, আমরা আমাদের কথা রাখছি, তুমি যা বলেছ তা কাকপক্ষীতেও টের পাবে না। আজ কোর্ট থেকেই ছাড়া পেয়ে যাবে তোমরা। আমরা এখনই সব খবর প্রকাশ করছি না। কিন্তু বলো তো বাবা, তোমাদের ওই বসকে কোথায় পাওয়া যাবে?''

''আমি জানি না। সত্যি বলছি জানি না।''

সুদর্শন অর্জুনের দিকে তাকালেন। অর্জুন ইশারায় বলল সত্যি বলছে।

"মানাভাই?"

"মানাভাইয়ের বাড়ি কোথায় জানি না, তবে ওঁকে এয়ারভিউ হোটেলের উল্টো দিকের মারুতি স্ট্যান্ডে বেশির ভাগ সময় দেখা যায়।"

"গুড। শোনো হারাধন, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ এই রকম ডাকাতি করে বেশিদিন কেউ জেলের বাইরে থাকতে পারে না। তোমার স্টেটমেন্ট অনুযায়ী আমরা তোমাকে শাস্তি দিতে পারতাম। কিন্তু তুমি শাস্তি পেলে ডাকাতি বন্ধ হবে না। তোমাদের বস নতুন ছেলেকে দলে নেবে। তাই আগে তাকে ধরা দরকার। আমি তোমার কাছে খবর চাই।" সুদর্শন বললেন।

হারাধন চুপ করে থাকল। অর্জুন শুনল, "আমি খবর দিচ্ছি জানতে পারলে বস আমাকে মেরে ফেলবে। তার চেয়ে জেলে যাওয়া ভাল।"

অর্জুন হাসল, "তুমি ঠিকই ভাবছ।"

সুদর্শন জিজ্ঞেস করলেন, "কী ভাবছে ও?"

"আপনাকে খবর দিয়েছে জানতে পারলে ওর বস ওকে মেরে ফেলবে।"

হারাধন চেঁচিয়ে উঠল, "আপনি কি করে মনের কথা টের পান?"

অর্জুন বলল, "উত্তরটা আগেই দিয়েছি। শোনো, খবর দিতে তোমাকে এখানে আসতে হবে না। যে কোনও খবর তুমি টেলিফোনে জানিয়ে দিও। এই আমার নম্বর ওকে লিখে দিন।"

সুদর্শন কাগজ টেনে লিখে এগিয়ে দিলেন।

অর্জুন বলল, "এটা ভাল করে মুখস্থ করে ছিঁড়ে ফেলো। সঙ্গে রাখা ঠিক হবে না। আচ্ছা,এবার আমি উঠি।"

অর্জুন বেরিয়ে এল।

গলিতে ঢুকতেই বুড়িদিকে দেখতে পেল সে। বুড়িদি তাদের বাড়ির জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। একটু কাছে যেতেই সে স্পষ্ট বুড়িদির গলা শুনতে পেল, "খালি হাতে আসছে? মুখে বড় বড় কথা কিন্তু উপকার করার বেলায় নেই। যখন গোয়েন্দাগিরি করত না তখন ভাল ছেলে ছিল। এখন খুব নাম হয়ে গেছে তাই ল্যাজ মোটা হয়ে গেছে।"

বুড়িদির ভাবনা শুনতে পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল অর্জুন। বুড়িদি তার সম্পর্কে এই রকম ভাবে? সে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

আর-একটু এগোতেই একগাল হেসে বুড়িদি জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ রে পেলি?"

"এখনও পাইনি।" অর্জুন সহজ হতে পারছিল না।

"দ্যাখ না বাবা। আমার মুখের দাগ রোজ বেড়ে যাচ্ছে।"

অর্জুন আর দাঁড়াল না। তার বাড়ির দরজায় পৌঁছনো মাত্র সে ডাক শুনতে পেল, ''ও অর্জুন। একটু ওয়েট করো।''

সে দেখল, রামগোপালবাবু এগিয়ে আসনে, ''আমি অনেকক্ষণ ধরে তোমার অপেক্ষায় এখানে দাঁড়িয়ে আছি। বুঝলে?''

''কেন বলুন তো?''

''কথা আছে। তালা খুলে ভেতরে চলো।''

বাইরের ঘরের চেয়ারে বসে গলা নমালেন ভদ্রলোক, ''শোনো, আমি স্বীকার করছি তুমি অন্তর্যামী।

''কি যা-তা বলছেন?'' অর্জুন তীব্র আপত্তি করল।

''একদম যা তা নয়। আমার মনের কথা তুমি ঠিকঠাক বলে গেলে তখন। আমি যা ভেবেছি তাই বলেছ। বাবা, ওই সব ভাবনা আমি ইচ্ছে করে ভাবিনি, হঠাৎ মাথায় এসে গিয়েছিল কিন্তু তুমি সেটা হুবহু বলে দিয়েছ। আমি অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে ঘোরাঘুরি করেছি কিন্তু তাদের কেউ এখন সে ক্ষমতার অধিকারী নন।''

''আপনি চা খাবেন কাকা?''

প্রশ্নটা করেই অর্জুন শুনতে পেল রামগোপালবাবু ভাবছেন, আমাকে কাটিয়ে দেওয়ার মতলব করছে ছোকরা। কিন্তু আমি ছাড়ব না।''

''না ছেড়ে কী করবেন?''

''অ্যাঁ? তবে? দ্যাখো বাবা, আমার সঙ্গে লীলা কোরো না।''

''কী বলতে চাইছেন আপনি?''

আর একটু এগিয়ে এলেন রামগোপালবাবু, ''তুমি তো স্টেডি কাজকর্ম করো না। মাঝে মাঝে গোয়েন্দাগিরি করো বটে, তাতে ক'টা টাকাই বা হয়। তোমাকে আমি মাস মাইনের চাকরি দেব। ধরো মাসে পাঁচ হাজার।''

''সে কি! এত টাকা!''

''দিতাম। ছেলেবেলা থেকে দেখছি তোমাকে। এটুকু না হয় করলাম।''

''আমাকে কি কাজ করতে হবে?''

''আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হবে। চারধারে প্রচুর শত্রু আমার। সবাই প্যাঁচ কষছে কিভাবে আমাকে গর্তে ফেলা যায়। কারও মনের কথা বুঝতে পারি না আমি। তুমি সঙ্গে থাকলে ওদের মনের কথা আমি শুনে ফেলব। মানে তুমি বলবে আমি শুনব।'' তৃপ্তির হাসি হাসলেন রামগোপালবাবু। যেন শত্রুকে কবজা করে ফেলেছেন।

''তাতে একটু অসুবিধে আছে কাকা।''

''কি রকম?''

''আপনার শত্রুরা যেই জানতে পারবে আপনি নন আমি জেনে আপনাকে ওদের মনের কথা বলে দিচ্ছি অমনি ওরা আমাকে হাত করতে বেশি টাকা অফার করবে। আমার কাছে আপনার মনের কথা জানতে চাইবে।''

''আমার মনের কথা?'' চুপসে গেলেন রামগোপালবাবু।

''আজ্ঞে হ্যাঁ।''

রামগোপালবাবু তাকালেন, অর্জুন শুনতে পেল, ''এ দেখছি মহাধূর্ত!''

''আমাকে মহাধূর্ত বলুন আর যাই বলুন কথাটা সত্যি।''

সঙ্গে সঙ্গে অপরাধীর ভঙ্গি করলেন ভদ্রলোক, ''ছি ছি ছি। আমি ভাবতে চাইনি কিন্তু ভেবে ফেলেছি। তা তোমাকে বেশি টাকার লোভ দেখালেই বা ওদের দলে যাবে কেন? তোমার বিবেক বলে কিছু তো আছে!''

''তা আছে। কিন্তু একই সঙ্গে আমি যে আপনার মনের কথাও জেনে যাব। সেটা কি আপনার ভাল লাগবে?''

''না। লাগবে না।'' মাথা নাড়তে লাগলেন রামগোপালবাবু।

''তা হলে?''

''আচ্ছা বাবা, এই বিদ্যে তুমি কোথায় আয়ত্ত করলে?''

''স্বপ্নে। মাটি থেকে এক হাত ওপরে শরীরটাকে তুলে নিয়ে যেতে পারলেই দেখবেন মানুষের মনের কথা শুনতে পাচ্ছেন।''

''সে তো শুনেছি যোগী ঋষিরা পারেন।''

''হ্যাঁ। আপনার শরীর ভারী হয়ে গেছে, বাস্তবে পারবেন না। আপনি স্বপ্নে চেষ্টা করে দেখুন। পেয়ে যাবেন।''

রামগোপালবাবু চলে গেলেন বিষন্ন মুখে। এখন হয়তো কয়েক রাত তিনি ওরকম স্বপ্ন দেখার চেষ্টা করবেন। সফল না হলে জলপাইগুড়ি শহরে প্রচার করবেন অর্জুনের ক্ষমতার কথা।

একলা ঘরে বসে অর্জুন রুদ্রাক্ষের মালাটাকে দেখল। এটা পরলে মানুষ অদ্ভুত ক্ষমতা পায়। ঠিক কথা। কিন্তু সেইসঙ্গে দুঃখকে ডেকে আনা হয়। এই যে বুড়িদি তার সম্পর্কে এরকম ভাবে তা রুদ্রাক্ষ পরার আগে সে জানত না। পরিচিত প্রিয় মানুষের মনের খারাপ দিকটা জেনে ফেললে পৃথিবীতে বেঁচে থাকাই মুশকিল হয়ে পড়বে। যাকে আমি খুব ভালবাসি সে আমার সম্পর্কে মনে এক আর মুখে আর এক বলে সেটা জানার পর সম্পর্ক রাখা কি সম্ভব? অর্জুনের মনে হল, এই মালা তার ভাবার ক্ষমতাকে ক্রমশ নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছে। সত্যসন্ধান করতে যদি তাকে এই মালার ওপর নির্ভর করতে হয় তা হলে তার স্বকীয়তা কোথায় রইল। বরং খুব প্রয়োজনে যেমন রিভলভার বের করতে হয় তেমনি কোনও উপায় না থাকলে এটাকে পরবে সে।

দুপুরের খাওয়া শেষ করে মনে হল অমল সোমের সঙ্গে দেখা করে এলে হয়। এই রুদ্রাক্ষের মালা নিয়ে ওঁর সঙ্গে আলোচনা না করা পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছে না সে।

গেট খুলে ভেতরে ঢুকে অর্জুন দেখল বাইরের ঘরের দরজা বন্ধ। অমল সোম দুপুরে ঘুমোন না। নির্দ্বিধায় দরজায় শব্দ করল সে। কোনও সাড়া নেই। বেশ কয়েকবারের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর খিড়কি দরজায় পৌঁছে ফাঁক দিয়ে আঙুল গলিয়ে শেকল খুলল সে।

এখন দুপুরের শেষ। ভেতরের বারান্দায় ছায়া পড়েছে। অর্জুন দেখল অমল সোমের থাকার ঘর দুটোর ভেতরদিকের দরজায় তালা ঝুলছে। বুকের ভেতরটায় ছ্যাঁত করে উঠল। তালা কেন? অমলদা কি চলে গেছেন। সে হাবুর ঘরের দিকে তাকাল। দরজা খোলা। সেখানে গিয়ে দেখল হাবু ভেতরে নেই। অতএব বাগানে চলে এল অর্জুন। বরং তখনই হাবুকে দেখতে পেল। পেয়ারা গাছের নীচে মাদুর পেতে চিত হয়ে শুয়ে আছে হাবু। না, ঘুমোচ্ছে না। ওর চোখ গাছের ডালে বসে থাকা একটা নীলকণ্ঠ পাখির দিকে স্থির। অর্জুনকে দেখে পাখিটা ডানা ঝাপটে উড়ে গেল। পাখির উড়ে যাওয়ার কারণ খুঁজতে মুখ ফেরাতে হাবু তাকে দেখতে পেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসল।

অর্জুন হাতের ইশারার সঙ্গে কথা বলে জানতে চাইল অমল সোম কোথায়?

হাবুর মাথায় এখনও ব্যান্ডেজ। পাটি মাটি থেকে তুলে ভাঁজ করছিল সে, কিন্তু অর্জুন স্পষ্ট শুনতে পেল, "ঘর থেকে যার মন উঠে গেছে তাকে আর ঘরে পাবে কী করে?"

হাবুর গলার স্বর কোনওদিন শোনেনি অর্জুন, কারণ সে কথা বলতে পারে না। এখন যে কণ্ঠস্বর কানে এল সেটা বেশ ঘরঘরে, অমার্জিত। অর্জুন চমৎকৃত। সে হাবুর মনের কথা শুনতে পাচ্ছে? বাঃ।

পাশ কাটিয়ে হাবু চলে গেল তার ঘরে। যাওয়ার সময় অর্জুনের কানে এল, "আর আমার এখানে থাকার ইচ্ছে নেই। আমিও চলে যাব।"

হাবু ফিরে এল একটা খাম নিয়ে। সেটা খুলতেই চিঠি দেখতে পেল অর্জুন। "কল্যাণবরেষু, আশা করি আজ বিকেলের মধ্যে তুমি এই বাড়িতে একবার আসবে। গতকাল আমি নিউ বঙ্গাইগাঁও যাওয়ার জন্যে বেরিয়েছিলাম। পথে কয়েকটা রেল ডাকাতের জন্যে যাত্রা বিঘ্নিত হয়েছিল। তাই আজ আবার রওনা হচ্ছি। এখানে এসে বুঝলাম একা থেকে থেকে শ্রীমান হাবু খুব কাহিল হয়ে পড়েছেন। তার নার্ভ এই একাকিত্ব সহ্য করতে পারছে না। তার ওপর বিনা কারণে তার কপালে গত রাতে প্রহার জুটেছে। ওকে আর এভাবে একা ফেলে রাখা উচিত নয়। আমি দিন সাতেকের মধ্যে নিউ বঙ্গাইগাঁও থেকে ফিরে আসব। তারপর যা হোক একটা ব্যবস্থা করব। তোমার মা সম্ভবত দিন সাতেকের মধ্যে জলপাইগুড়িতে ফিরে আসছেন না। খুব যদি

অসুবিধে না হয় তা হলে তুমি কি হাবুকে একটু সঙ্গ দিতে পারবে? -তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, অমল সোম।"

তার নীচে আবার পুনশ্চ দিয়ে লিখেছেন, "রুদ্রাক্ষের মালাটি যদি কোনও সমস্যা তৈরি করে তা হলে হাবুর কাছে রেখে দিও। -অমল সোম।"

এইটুকু? যেন রুদ্রক্ষের মালার কোনও ভূমিকা নেই যে তাকে নিয়ে কিছু লেখার প্রয়োজন আছে! সমস্যা হয় বলতে কি বোঝাচ্ছেন? অমলদা কি জানেন না এই মালার মাহাত্ম্য কী?

অর্জুন শুনল, "কি লিখেছে কে জানে!"

অর্জুন ইশারা করে বোঝাল অমল সোম সাত দিনের মধ্যে ফিরে আসবেন এবং ততদিন তাকে এ-বাড়িতে থাকতে বলেছেন।

হাবুর মুখে হাসি ফুটল। অর্জুন শুনল, "বাঃ, খুব ভাল কথা। তা হলে আজ রাত্রে মাংস রাঁধতে হয়।"

অর্জুন পকেট থেকে টাকা বের করে হাবুর হাতে দিতে হাবু খুব অবাক হয়ে তাকাল। অর্জুন বলল, "একটু পরে মাংস কিনে এনো।"

ঠোঁট নাড়া দেখে কথা বোঝার ক্ষমতা আছে হাবুর। অর্জুন তাকে মাংস আনতে বলছে বুঝতে পেরে তার চোখ বড় হয়ে গেল। অর্জুন শুনল, "শুধু মাংস না, সঙ্গে মিষ্টি দই আনব।"

অর্জুন মাথা নাড়াল, "রাত্রে মিষ্টি দই খেতে নেই।"

ঠোঁট নাড়া দেখে কথাটাকে বুঝতে পেরে হাবু মাটিতে বসে পড়ল। সে একদৃষ্টিতে অর্জুনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আজ পর্যন্ত অমল সোম ছাড়া কেউ তার মনের কথা বুঝতে পারেনি। অমল সোমও এত স্পষ্ট কোনওদিন বলতে পারেননি।

অর্জুন সরে এল। বাগানে হাঁটতে হাঁটতে সে স্থির করল ক'দিন না হয় এখানেই থেকে যাবে। কিন্তু অমল সোম বিশ্বনাথদের সম্পর্কেও কোনও কথা চিঠিতে লেখেননি! হঠাৎ এত নিরাসক্ত হয়ে গেলেন কী করে? এই সময় সামনের বনফুলের গাছের ডালে বসে একটা দাঁড়কাক কুৎসিত গলায় চিৎকার করে উঠতেই অর্জুন কাকটাকে দেখতে পেল। দু'পা এগোতেই সে অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেল। কেউ কিছু বলছে কিন্তু তার কোনও শব্দ সে বুঝতে পারছে না। সেই শব্দহীন স্বর ঘষঘষে। কাকটা উড়ে যাওয়া মাত্র সেই স্বর কান থেকে মিলিয়ে গেল।

অর্জুন হতভম্ব হয়ে গেল। ব্যাপারটার ব্যাখ্যা এই যে, কাকটা তাকে দেখে যা ভাবছিল তা তার কানের পর্দায় শব্দ হয়ে এসে আঘাত করছিল। যেহেতু ওর ভাষা তার জানা নেই তাই সে কোনও অর্থ উদ্ধার করতে পারেনি। তার মনে বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু অথবা নেপালি ছাড়া অন্য ভাষাভাষী মানুষ যদি কিছু ভাবে তা হলে এই রুদ্রাক্ষের মালা কোনও সাহায্য করতে পারবে না। সে একটু-আধটু ওড়িয়া ভাষা

বুঝতে পারে। একজন উৎকলবাসী কিছু ভাবলে সে যেটুকু বোঝে সেটুকু বুঝতে পারবে?

ব্যাপারটা পরীক্ষা করার জন্যে সে বাড়ির বাইরে চলে এল। গেটের বাইরে একটা গোরু চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। অর্জুন তার দিকে এগোতেই গোরুটা সতর্ক হয়ে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত একটা রাগী শব্দ কানে এল। অথচ গোরুটা মুখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে। এই শব্দের সঙ্গে কাকের ভাবনার শব্দের কোনও মিল নেই। অর্জুন ধীরে ধীরে আবার পিছিয়ে যেতে শব্দটা স্বাভাবিক হয়ে মিলিয়ে গেল। অর্জুন দেখল গোরুটা নিশ্চিন্ত হয়ে হেঁটে যাচ্ছে। অর্জুন মালাটার রুদ্রাক্ষে আঙুল রাখল। ঠিকই। গোরুদের ভাষা তার জানা নেই বলে সে শব্দটার অর্থ পরিষ্কার বুঝতে পারল না। তবে ওই আওয়াজের ধরণ বলে দিচ্ছে সে এগিয়ে যাওয়াতে গোরুটা খুব বিরক্ত হয়েছিল।

বিকেলে হাবু বাজার করে নিয়ে আসার পর অর্জুন বের হল। করলা নদীর পাশ দিয়ে এগোতেই দেখল একটা মারুতি ভ্যান বেশ জোরে এগিয়ে আসছে। ভ্যানটা তার পাশে এসে বেশ জোরে ব্রেক কষে থেমে যেতেই অর্জুন বিরক্ত হয়ে দেখল একটা লোক দ্রুত চালকের আসন থেকে নেমে পড়েছে। তার সামনে এসে লোকটা হাতজোড় করে বলল, "ভাল আছেন দাদা? অনেকদিন বাদে আপনার দর্শন পেলাম।"

লোকটি রোগা, মধ্য বয়সী, প্যান্টের ওপর ধূসর রঙের গেঞ্জি, যা ময়লা হলেও বোঝা যাবে না। লোকটি বলল, "আমাকে চিনতে পারছেন না দাদা?"

অর্জুন সত্যি কথা বলল, "ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"সে কী! আমার কপালটাই খারাপ। ঠোঁটকাটা চাঁদুকে মনে আছে?"

মনে পড়ে গেল। মালবাজারে থাকত ঠোঁটকাটা চাঁদু। ঠোঁটের ওপরটায় অনেকটা কাটা ছিল বলে সবাই ওকে ডাকত ঠোঁটকাটা চাঁদু বলে। সেবার একটা কাঠচুরির কেসে পুলিশ ওকে জড়িয়ে ফেলেছিল। সে-সময় অর্জুন লোকটার উপকারে এসেছিল। সেই ঠোঁটকাটা চাঁদুর সঙ্গে একে দেখেছে সে।

"আমার নাম মাধব। ডাক নাম মাধু।"

"তাই বলো। চাঁদু-মাধুর মাধু তুমি। তখন তো এরকম পোশাক পরতে না?"

খুব লজ্জা পেয়ে গেল মাধব, "আজ্ঞে, এখন গাড়ি চালাই, টু-পাইস হয়, এখন এসব না পরলে খারাপ দেখায়। কোথায় যাচ্ছেন, চলুন পৌঁছে দিচ্ছি।"

"না, না। আমি হাঁটতে বেরিয়েছি।" অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "গাড়িটা কার?"

"শিলিগুড়ির মালিক। আমি মান্থলি কন্ট্রাক্টে চালাই। জলপাইগুড়িতে এসেছিলাম একজন প্যাসেঞ্জার ছাড়তে। আমার গাড়িতে একটু উঠবেন না দাদা?"

"তুমি তো যাচ্ছ আমার উল্টো দিকে।"

'' কোনও জরুরি কাজে যাচ্ছিলাম না, এক বন্ধুর বাড়ি ঘুরে যেতাম। আপনি উঠুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাব।'' মাধবের অনুরোধ আর এড়ানো গেল না।

কদমতলার মোড়ে যখন ওরা পৌঁছল তখন সন্ধে হব হব। ভ্যান থামলে অর্জুন বলল, ''তুমি তো বেশ ভালই চালাও।''

''আপনাদের আশীর্বাদে এসব হয়েছে। নইলে এখনও মালবাজারে পড়ে থাকতাম। পেট চালাতে কি না করতে হত।''

''এখন কেমন রোজগার কর।''

''দু'নম্বরি না করলে দিনে শ'দুয়েক থাকে।'' মাধব হাসল।

''কি রকম দু'নম্বরি?''

''টানা জিনিস পাচার করছে বুঝেও না বোঝার ভাম করে ভাড়া খাটলে ডবল ইনকাম। আরও কত কী!''

''তুমি দু'নম্বরি করো না?''

''সত্যি কথা বলছি দাদা, বাধ্য না হলে করি না।''

''বাধ্য না হলে মানে?''

''যন্ত্র দেখিয়ে বলে যেতে হবে। কথা না শুনলে লাশ হয়ে যাব।''

''পুলিশকে বলে দাও না কেন?''

''এ কি বলছেন দাদা। ভাড়া খেটে খায়, পুলিশ আমাকে কতক্ষণ বাঁচাবে? চুকলি করেছি বলে আরও সর্বনাশ করে ছাড়বে।''

মাধব চলে গেল গাড়ি নিয়ে। এক সঙ্গে ভাল এবং খারাপ লাগছিল অর্জুনের। মাধবের জন্যে। তারপরেই খেয়াল হল এতক্ষণ মাধবের সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও ওর মনের কথা সে একবারও শুনতে পায়নি। এর অর্থ, মাধব একবারও মনে মনে অন্য চিন্তা করেনি? তা হলে তো ছেলেটাকে সত্যি সৎ বলতে হবে।

বাড়িতে গিয়ে সব বন্ধ করে অমল সোমের বাড়িতে ফিরে এল সে সন্ধের পরে। হাবু তাকে চা বানিয়ে দিল। আমল সোমের ঘরের তালা খুলে দিয়েছে হাবু। তার মধ্যে এখন বেশ ফুর্তির ভাব। যখনই সে অর্জুনের কাছাকাছি হয়েছে তখনই সেই ফুর্তির প্রকাশ জানতে পেরেছে ওর ভাবনায়। একটা মানুষ যদি বাড়িতে থাকে তা হলে কোনও কষ্ট হয় না। কাজে আমি ভয় পাই না। কিন্তু নিজের জন্যে কাজ করতে একটুও ভাল লাগে না। তা ছাড়া অর্জুনবাবু মানুষটা ভাল। আজ কতদিন হল না ওকে দেখছি। যখন প্রথম বাবুর কাছে এসেছিল তখন তো প্রায় বাচ্চা ছেলে।

এই সব কথা কানে গেলেও অর্জুন কিছু বলল না। হাবু তার রান্নাঘরে চলে গেলে সে অমল সোমের চেয়ারে বসল। টেবিলের ওপর পেপারওয়েট, কিছু কাগজ আর অনেক বই। এইসব বই বিচিত্র। গীতা, বাইবেল, সৈয়দ মুজতবা আলির রচনাবলীর সঙ্গে আগাথা ক্রিস্টি মিলেমিশে রয়েছে। অর্জুন ওসবে হাত না দিয়ে গলা থেকে

মালাটাকে খুলে টেবিলে রাখল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল সে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। কানের পর্দা যেন ফেটে গেছে এমন একটা আওয়াজ মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছিল। সে কান চেপে ধরল কিছুক্ষণ। ধীরে ধীরে কান স্বাভাবিক হয়ে এল। তখন শরীরে বেশ অবসাদ, যেন দু'মাইল টানা ছুটে এসেছে।

রুদ্রাক্ষগুলো গোল নয়, অনেকটা ঢোলকের সাইজ। একটাই মুখ। এ ছাড়া অন্য কোনও বিশেষত্ব নেই। প্রতিটি বীজের মধ্যে ফাঁক নেই বললেই চলে। এখনও কী দিয়ে মালাটা গাথাঁ, ঠাওর করতে পারল না অর্জুন। পৃথিবীর মানুষের বুদ্ধির বাইরে একটি কান্ড ঘটিয়ে চলেছে এই মালা। বিজ্ঞান যেখানে থমকে থাকবে সেখানে এ সক্রিয়। অমল সোমের হাতে না পড়ে কোনও বুদ্ধিমান শিক্ষিত অপরাধীর হাতে পড়লে লোকটা মালার সাহায্যে কত কিছু করতে পারত। এখন প্রশ্ন হল, অমল সোম মালাটাকে কোত্থেকে পেলেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন, এমন মূল্যবান জিনিস তিনি অবহেলায় কেন হাতছাড়া করলেন?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর একমাত্র অমল সোমই দিতে পারেন। কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে নানান কারণ অনুমান করা যায়। এ কথা ঠিক অমল সোম তাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। এই মালা তাকে দিয়ে তিনি যাচাই করতে চেয়েছেন। সে কীভাবে এর ব্যবহার করে তা দেখতে চেয়েছেন। মালাটা কোনও সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে বলে তাঁর সন্দেহ ছিল এবং সেক্ষেত্রে হাবুর কাছে রেখে দিতে নির্দেশ দিয়ে গেছেন। আর কিছু না হোক, উনি জানতেন মালা নিয়ে অর্জুন বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। অর্জুন বইগুলোর দিকে তাকাল। একটি নাম তাকে আকর্ষণ করল। বইটির নাম, 'মনের কথা' বইটি হাতে নিয়ে দেখল লেখকের নাম স্বামী হৃদয়ানন্দ। মাত্র একশো পাতার বই। সে পাতা ওল্টাল। মানুষের মন নিয়ে লেখক গবেষণা করেছেন। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ পেন্সিলের দাগ চোখে পড়ল। যদি অমল সোম দাগিয়ে থাকে তা হলে নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে। এই পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত যেসব শব্দ বেজে যাচ্ছে তার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ আমাদের শ্রবণযন্ত্র গ্রহণ করতে সক্ষম। মানুষের ইন্দ্রিয়গুলোর কার্যক্ষমতা সীমাবদ্ধ। এই কারণে মানুষ অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত। কখনও কখনও কোনও পশুর ইন্দ্রিয় মানুষের থেকে অনেকগুণ শক্তিশালী বলে প্রমাণিত। শকুন যে দূরত্ব থেকে তার খাদ্যবস্তু আবিষ্কার করে সেই দূরত্বে মানুষের দৃষ্টি শক্তিহীন। ঝড়বৃষ্টির আগে পিঁপড়েরা আতঙ্কিত হয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে দৌড়োয় অথচ আকাশে তখনও দুর্যোগের চিহ্ন ফুটে ওঠে না সে-সময়। মানুষের পক্ষে আগাম এই অনুমান করা সম্ভব নয়। কিন্তু কোনও কোনও মানুষ এই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছেন।

এই সক্ষমতা এসেছে চিন্তার ব্যায়ামের মাধ্যমে। ব্যায়াম যেমন শরীরকে মেদশূন্য করে তেমনই চিন্তার ব্যায়ামে মন চিন্তাশূন্য হয়। যখন সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় তখন দ্বিতীয় শ্রবণযন্ত্রের জন্ম হয়, যা বাতাসে মিশে থাকা শব্দাবলী শুনতে সাহায্য

করে। কথিত আছে হিমালয়ের কোনও কোনও যোগী পুরুষ তাঁদের সাধনালব্ধ শক্তি পৃথিবীর জাগতিক কোনও বস্তুর মধ্যে নিহিত করে রাখেন। যেভাবে পাথর ধারণ করলে মানুষের নানান উপকার হয় তেমনই সেই সব বস্তু ধারণে সাধনা ছাড়াই মানুষ ফললাভ করতে পারে। পাথর, মাদুলি অথবা তাবিজে যেসব সভ্য শিক্ষিত মানুষ অত্যন্ত আস্থাবান তাঁরা নিশ্চয়ই এই তথ্য অস্বীকার করতে পারবেন না।

এখানেই দাগ শেষ হয়েছে। অমল সোম এখানে কবে দাগ দিয়েছেন? এবারে, না অনেক আগে?

হাবু কখন ঘরে ঢুকেছে টের পায়নি অর্জুন। হাবুর হাতে রাতের খাবারের থালা। ইশারায় খেতে বসতে বলছে। অর্জুন ঝটপট মালাটা পরে ফেলল। পরামাত্র শরীর গরম হয়ে উঠল। জ্বালা নয়, একটা তপ্ত হাওয়া যেন ঢেউয়ের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল সমস্ত শরীরে। মাটিতে পড়তে পড়তে চেয়ারে বসে পড়ল অর্জুন ধপ করে। পড়ে স্থির হয়ে রইল কিছুক্ষণ। সে চোখ বন্ধ করতে বাধ্য হল।

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল থালা হাতে হাবু। অর্জুনের শরীর খারাপ হয়েছে ভেবে সে হাউমাউ করে থালাটাকে খাওয়ার টেবিলের ওপর রাখতে ছুটল। ততক্ষণে শরীর শান্ত হয়েছে অর্জুনের। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ানো মাত্র হাবু ছুটে ফিরে এল। তাকে কোনও পাত্তা না দিয়ে খেতে বসে গেল অর্জুন। হাবু ইশারায় জিজ্ঞেস করে গেল, শরীর খারাপ কি না, অর্জুন মাথা নেড়ে না বলে গেল। অর্জুন শুনল, হাবু ভাবছে, চোখের সামনে দেখলাম চোখ বন্ধ হয়ে গেল, পা টলে গেল, তবু স্বীকার করছে না।

সকালে সুদর্শন এ-বাড়িতে হাজির হলেন, "আপনি এখানে যে আছেন তা তো জানি না। আপনার বাড়িতে লোক পাঠালাম, ফিরে এসে জানাল তালা বন্ধ।"

"বসুন। কী ব্যাপার?"

"পাখি তো উড়ে গেল।"

"তার মনে?"

"কোন শেষ বেলায় কোর্টে প্রোডিউস করতেই ওদের উকিল হইচই লাগিয়ে দিল। যেহেতু আমাদের চার্জে কোনও জোরালো পয়েন্ট নেই তাই পুলিশ আটকে রাখতে পারে না। জামিন পেয়ে গেল।"

"তারপর?"

"ওরা কদমতলায় গিয়ে বাসে উঠেছিল। হারাধন রেল গেটে নেমে গেছে, বিশ্বনাথ মণ্ডলপাড়ায়। কিন্তু উকিল ফিরে গেছে শিলিগুড়িতে।"

"ওঁকে ফলো করেনি আপনার লোক?"

"কি বলব বলুন! যেহেতু বলা ছিল ওই দু'জনকে কভার করতে হবে তাই তাঁর মাথায় উকিলের কথা ঢোকেনি।"

"একটা সুযোগ হারালেন। আমার বিশ্বাস উকিলকে শিলিগুড়ি থেকে অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছিল। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই রিপোর্ট দিয়েছেন।"

"হ্যাঁ। আমিও তাই মনে করি। তবে পালা করে মন্ডলপাড়া বাসস্টপে লোক রেখেছি। বিশ্বনাথ বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাসে উঠলেই ওকে ফলো করবে।"

"ওরকম জায়গায় অচেনা লোককে দেখলে সবাই সন্দেহ করবে না?"

"জলপাইগুড়ির কেউ নয় ওখানকার লোক।"

"কিন্তু ধরুন, যদি ও বাসে না গিয়ে প্রাইভেট কারে যায়?"

"এটা তো আমার মাথায় ছিল না। কিন্তু ওর মতো একটা নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলে প্রাইভেট কার পাবে কোথায়?"

"যার প্রয়োজন সে পাঠাতে পারে। হারাধন ফোন করেছিল?"

"না। আপনি আমাকে চিন্তায় ফেললেন। এদিকে কাল রাতে এস পি সাহেব ডেকেছিলেন। ট্রেনডাকাতির সঙ্গে জড়িত বলে সন্দেহ করেছি, অ্যারেস্ট করে এনেছি অথচ জামিনের বিরোধিতা তেমন করে করলাম না কেন জানতে চাইছিলেন? কেন আরও সিরিয়স চার্জ ওদের বিরুদ্ধে সাজালাম না? আমি আপনার কথা বললে সেটা আমার বিরুদ্ধে যেত। কোনওমতে ম্যানেজ করেছি। কিন্তু উনি খুশি হননি।"

অর্জুন বলল, "আমাদের পরিকল্পনার কথা ওঁকে খুলে বললেন না কেন?"

"বলে লাভ হত না।। কারণ হারাধন যে ফিরে গিয়ে আমাদের সাহায্য করবে তার তো কোনও নিশ্চয়তা নেই।" সুদর্শনকে বিমর্ষ দেখাচ্ছিল।

ওঁর জিপ গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। অর্জুন দেখল একজন সেপাই বেশ উত্তেজিত হয়ে গেট খুলে ছুটে আসছে। সুদর্শন জিজ্ঞেস করল, "কি হল?"

"সার মেসেজ এসেছে, আজ সকালে তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেসে ডাকাতি হয়েছে।"

"সে কি!" এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে জিপে পৌঁছে গিয়ে ওয়াকিটকি চালু করলেন সুদর্শন। অর্জুন পেছনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। কথা শেষ করে সুদর্শন বললেন, "আর দাঁড়ানো যাচ্ছে না। একেবারে নাকের ডগায় ডাকাতিটা হয়েছে।"

"কোথায়?"

"রানিনগর আর জলপাইগুড়ি রোডের মাঝখানে। আমি চলি।" সুদর্শন জিপে উঠে বসতেই অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি ওখানেই যাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ। ট্রেনটাকে জলপাইগুড়ি রোডে দাঁড় করিয়ে রেখেছে।"

"আমি সঙ্গে গেলে অসুবিধে হবে?"

সুদর্শন একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, "আসুন।"

।।৪।।

জলপাইগুড়ি শহরের দু'পাশ দিয়ে দুটো ট্রেন লাইন চলে গেছে। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে সগর্বে এসে রানিনগর স্টেশনে ওরা আলাদা হল। ফলে

জলপাইগুড়ি দুটো স্টেশন পেয়ে গেল। একটা সেই পুরনো স্টেশন যা শহরের বুকের ওপর হলেও অব্যবস্থা এবং অযত্নে প্রাগৈতিহাসিক হয়ে রয়েছে। বড় ট্রেন বলতে দার্জিলিং মেলের কয়েকটা কামরা বিকেল বেলায় যাত্রী টেনে আনে। দ্বিতীয় স্টেশনটা ছিমছাম, অনেকটা লম্বা প্ল্যাটফর্ম, নামী ট্রেনগুলো থামে বা না থেমে ছুটে যায় অসম থেকে বা অসমে। কিন্তু স্টেশনটায় পৌঁছতে হাঙ্গামা করতে হয়। তিস্তা নদীর প্রায় কোল ঘেঁষে এই স্টেশনে পৌঁছতে রাত বিরেতে রিকশা পাওয়া মুশকিল। ট্রেন লেট হলে বিপাকে পড়তে হয়।

সুদর্শনের জিপ এই দ্বিতীয় স্টেশনের দিকে ছুটছিল। জলপাইগুড়ির রাজবাড়ি পেরিয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ে ডিঙিয়ে রেল লাইনের কাছে পৌঁছে সুদর্শন বললেন, "একটা কথা বলছি বলে কিছু মনে করবেন না।"

"নিশ্চয়ই না। বলুন।"

"আমাদের বড়কর্তারা এতক্ষণে নিশ্চয়ই পৌঁছে গেছেন এখানে। আপনি জিপ থেকে নামছেন এটা কেউ কেউ পছন্দ নাও করতে পারেন।"

"বুঝতে পেরেছি। জিপ থামাতে বলুন, নেমে যাচ্ছি।"

স্টেশনটা দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু ওই পথে প্রচুর মানুষ ছুটে যাচ্ছে।

দূরেও প্রচুর লোক দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ মুখে মুখে ডাকাতির খবর চাউর হয়ে গেছে। সুদর্শন বললেন, "না, থাক, আপনাকে নামতে হবে না।"

অর্জুন শুনতে পেল সুদর্শন বলছেন, "এসপি সাহেব যা-ই ভাবুন, আমার কি সামান্য ভদ্রতাবোধ থাকবে না? ছি ছি, কি বললাম ওঁকে!"

অর্জুন হেসে ফেলল। জিপ থেমে গিয়েছিল। মাটিতে পা বাড়িয়ে সুদর্শন জিজ্ঞেস করলেন, "হাসছেন কেন?"

"আপনার সঙ্কোচের কোনও কারণ নেই। আমি কিছুই মনে করিনি।"

সুদর্শন মাথা নাড়ালেন, "ওঃ, আপনাকে এড়ানোর উপায় নেই।"

ট্রেনটা দাঁড়িয়ে ছিল। যাত্রীদের চিৎকার চেঁচামেচি এখনও চলছে। স্থানীয় যুবকেরা তিনজন মানুষকে ট্রেন থেকে নামিয়েছে যারা মৃত না জীবিত বোঝা যাচ্ছে না। সুদর্শন তার দু'জন সেপাই কে নিয়ে কাজ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে বিশাল কনভয় ছুটে এল শহর থেকে। এস পি, ডি এস পি সাহেবরা প্রচুর সেপাই নিয়ে চলে এসেছেন। যাত্রীদের সঙ্গে সুদর্শনের ঝগড়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা নিরাপত্তাহীনতার জন্যে পুলিশকে দায়ী করছিলেন। সাধারণ পুলিশ এবং রেল পুলিশের যে পার্থক্য তা তাঁরা বুঝতে চাইছিলেন না। তিনটে শরীরকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল।

যাত্রীদের জিজ্ঞেস করে অর্জুন জানতে পারল ট্রেনটা একটু লেটে চলছিল। রানিনগর স্টেশনে গাড়িটা দু'ভাগ হয়ে যায়। এই কাটাকুটির জন্যে প্রায় মিনিট কুড়ি খরচ হয়। কুচবিহারের দিকে সেই অর্ধেক ট্রেন যাত্রা শুরু করা মাত্র এসি টু-টিয়ারে

সাতজন ছেলে ঢুকে পড়ে। তাদের মুখ কালো কাপড়ে বাঁধা ছিল। যাত্রীদের দামি জিনিসপত্র ছিনতাই করছিল বেশ রুক্ষভাবে। শেষ পর্যন্ত তিনজন যাত্রী বাধা দেন। এরা সঙ্গে সঙ্গে তিনজনের পেটে ছুরি চালায়। তখন চা-বাগানের মধ্য দিয়ে ট্রেন চলছিল। তারপরেই ট্রেন গতি কমায়। এরা চেন ধরে টানে। গতি আর একটু কমতে সবাই লাফিয়ে জঙ্গলে মিলিয়ে যায়। যেখানে ডাকাতি হয় তার চারপাশে কোনও লোকালয় ছিল না। এই কামরায় কোনও রেলরক্ষী না থাকায় ডাকাতরা সহজে পালাতে পেরেছে। সাধারণত ডাকাতি হয় থ্রি-টিয়ার স্লিপার ক্লাসে। আজ পর্যন্ত কখনও এসি কামরায় ডাকাতরা ডাকাতির জন্যে পছন্দ করেনি। পালাবার অসুবিধে হবে ভেবেই হয়তো অপছন্দ করেছে। তারা দামি টিকিট বলে রক্ষী থাকে বন্দুক নিয়ে। আজ এখানে রক্ষী ছিল না কিন্তু থ্রি-টিয়ার স্লিপার ক্লাসে বন্দুকধারী ছিল। সম্ভবত সেই কারণেই ডাকাতরা ওই কামরা এড়িয়ে গিয়ে এখানে হামলা করেছে আজ।

রেলপুলিশের কর্তারা এসে গেলে সুদর্শনের চাপ কমল। এর মধ্যে এস পি সাহেব সুদর্শনকে বলেছেন, "কী করব বলুন তো! দুটো ডাকাতকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দিলেন। ওরা থাকলে চাপ দিয়ে বের করা যেত এই ডাকাতি কারা করেছে। লোক তিনটে মারা গেলে খবরের কাগজ আমাদের ছেড়ে দেবে? আপনাদের একটা ভুলের জন্যে এইভাবে হেনস্থা হতে হয় আমাকে।"

"কিন্তু সার, এই ডাকাতি অন্য দলও করতে পারে।"

"আপনি কী করে জানলেন? কাল যাদের ছেড়ে দিয়েছেন তারাই যে আজ সকালে ডাকাতি করেনি তার কোনও প্রমাণ আছে আপনার কাছে?"

সুদর্শন কোনও জবাব দিতে পারলেন না।

খানিকটা দূরে অর্জুন এসি টু-টিয়ারের এক যাত্রীর কাছে ডাকাতদের চেহারার বর্ণনা শুনছিল। ভদ্রলোক যতটা মনে করতে পারছেন ততটাই বলতে গিয়েও গুলিয়ে ফেলছেন। যে লোকটা প্রথম ছুরি চালিয়েছিল তাকে মোটাসোটা বলেই মাথা নাড়লেন, ঠিক মোটা নয়। ওইরকম উত্তেজনার সময় দেখার স্মৃতি পরে বিশ্বাসঘাতকতা করতেই পারে।

এস পি সাহেব সুদর্শনকে জিজ্ঞেস করলেন, "ইনি এখানে কেন?"

সুদর্শন একটু পাশ কাটিয়ে বললেন, "হয়তো ট্রেনডাকাতির কথা শুনে এসেছেন। ওঁর সঙ্গে কথা বলবেন?"

"ডাকুন ওঁকে।"

সুদর্শন ডাকতেই অর্জুন এগিয়ে এসে বলল, "নমস্কার।"

এস পি সাহেব তাকালেন। অর্জুন শুনল, "মতলবটা কি? আমাকে অপদস্থ করার ধান্দায় আনা হয়েছে এখানে?" এস পি সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "আপনিও বুঝি এই ট্রেনে ছিলেন?"

"না। খবরটা শুনে ছুটে এলাম।"

"কেন?" এস পি সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "এই ট্রেনে আপনার কোনও ক্লায়েন্টের আসার কথা ছিল নাকি?"

"না। আমি কোনও মতলব বা কোনও ধান্দ নিয়ে এখানে আসিনি।"

অর্জুন শুনল, "আচ্ছা সেয়ানা তো!"

অর্জুন হাসল, "এস পি সাহেব, মিছিমিছি আমাকে গালাগালি না দিয়ে যাত্রীদের কাছে গিয়ে ডাকাতদের হদিস পাওয়া যায় এমন কোনও ক্লু খুঁজে বের করুন না!"

"কি? আমি আপনাকে গালাগালি দিয়েছি?" এস পি সুদর্শনের দিকে তাকালেন, "সুদর্শন, আপনি আমাকে কিছু বলতে শুনেছেন?"

সুদর্শন সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে না বলেন।

"কোনও ভদ্রলোককে অকারণে সেয়ানা ভাবা কি উচিত বলে মনে হয় আপনার? আচ্ছা, নমস্কার।" অর্জুন সরে এল ওখান থেকে।

এস পি সাহেবের মুখের চেহার দেখে সুদর্শন মজা পেলেন, "স্যার, অর্জুনবাবুর মধ্যে কিছু অলৌকিক ক্ষমতা লক্ষ করেছি।"

"যেমন?"

"উনি মনের কথা বুঝতে পেরে যান।"

"ডেঞ্জারাস ব্যাপার।আপনার মতো আমারও একই সন্দেহ হচ্ছে। এইসব লোক ইচ্ছে করলে বিশাল ক্রাইম করতে পারে। আরে মশাই, এটা কোনও অলৌকিক ব্যাপার নয়। আপনাকে সম্মোহিত করে ওর ইচ্ছে মতো আপনার ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। যাক গে, এসি কামরার প্যাসেঞ্জারদের এক এক করে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। আমি স্টেশন মাস্টারের ঘরে গিয়ে বসছি।" এস পি সাহেব চলে গেলেন।

কিন্তু যাত্রীদের রাজি করাতে পারলেন না সুদর্শন। নিরাপত্তার অভাবে তাঁরা এতক্ষণ বেশ উষ্ণ ছিলেন, এখন পুলিশ তাঁদেরই জেরা করবে জেনে খেপে গেলেন। তাঁদের দাবি, যার যা গিয়েছে তা রেল কর্তৃপক্ষ নথিবদ্ধ করে অঙ্গীকার করুক, অবিলম্বে ক্ষতিপূরণ করবে।

অর্জুন বুঝল এখানে অপেক্ষা করার কোনও মানে হয় না। সে স্টেশনের বাইরে এসে একটা রিকশা নিতে গিয়ে আবিষ্কার করল একটাও রিকশা নেই। এই ট্রেনের যেসব যাত্রী এখানে নেমেছে তাদের নিয়ে শহরে চলে গেছে রিকশাগুলো। অর্জুন হাঁটা শুরু করল। সুদর্শনকে বিরক্ত করার কোনও মানে হয় না। এস পি সাহেব থাকলে ওঁকে আদেশ মান্য করতেই হবে।

মিনিট সাতেক হেঁটে লেবেল ক্রসিং-এ পৌঁছে গেল অর্জুন এবং সেখানেই অজিত নাগের দেখা পেয়ে গেল। অজিত ওর জেলা স্কুলে পড়ত। খুব মাতব্বর ছিল সে-সময়। এখন কন্ট্রাক্টরি করছে।

''কী রে?'' তুই? ট্রেনে এলি?'' অজিত জিজ্ঞেস করল।

''না। তুই কেমন আছিস?''

''আর থাকা! আমরা কুলিগিরি করি তোর মতো নয়। কোথায় যাবি?'' অজিত জিজ্ঞেস করল।

''বাড়ি।''

''তা হলে চল তোকে আমি জলপাই মোড়ে নামিয়ে দিচ্ছি, ওখান থেকে রিকশা পেয়ে যাবি।'' অজিত তার মোটরবাইক চালু করল।

ওর পেছনে উঠে অর্জুন জানতে চাইল, ''তুই কোথায় যাচ্ছিস?''

''শিলিগুড়ি।''

বাইক চলছিল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, ''তোর সঙ্গে এক্স্ট্রা হেলমেট নেই?''

''আছে।'' অজিত মেরুদন্ড সোজা করে বাইক চালাচ্ছিল।

''আমাকে দে।''

''তুই তো একটু পরেই নেমে যাবি। এদিকে পুলিশ কোথায়?''

''আমি ভাবছি তোর সঙ্গে শিলিগুড়ি থেকে ঘুরে আসি।''

''যাবি? চল, তোকে একটা দারুন দোকানে মোমো খাওয়াব।'' অজিত বাইক থামাল। তারপর বাইকের বাক্স থেকে একটা হেলমেট বের করে অর্জুনকে দিল। হেলমেট পরলে মানুষের চেহারা পাল্টে যায়।

অজিত বাইক চালাচ্ছিল বেশ দ্রুত গতিতে। ছুটন্ত বাস বা লরিদের ও তেমন পাত্তা দিচ্ছিল না। অর্জুন নিজে হলে কখনওই এভাবে চালাত না। একসময় রেলগেটে এসে গেল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, ''তোর কি খুব তাড়া আছে?''

অজিত মাথা নাড়াল, না।

''তাহলে ওই চায়ের দোকানের সামনে একটু দাঁড়া।''

অজিত দাঁড়াল। মাটিতে নেমে অর্জুন দেখল দোকানে হারাধন নেই। সে দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল, ''আচ্ছা হারাধনের বাড়িটা কোথায়?''

দোকানদার তাকাল। অর্জুন শুনতে পেল, ''আর একজন এল।'' দোকানদার মাথা নাড়ল, ''ওকে বাড়িতে পাবেন না। সকালেই শিলিগুড়ি চলে গিয়েছে। কখন ফিরবে জানি না।''

''আমার আগে ওকে কে খুঁজতে এসেছিল?''

''জানি না।''

''আপনি তো দেখেছেন।''

''ওর কোনও বন্ধু বোধ হয়। বাড়ি কোথায় জিজ্ঞেস করতে দেখিয়ে দিয়েছিলাম। একটু পরেই দেখলাম হারধন ওর সঙ্গে বাসে উঠে গেল। কি ব্যাপার বলুন তো?''

অর্জুন মাথা নেড়ে আবার বাইকে উঠে বসল। বাইক চালু করে অজিত জিজ্ঞেস করল "এই হারাধনটা কে রে?"

"ট্রেনে ডাকাতি করেছিল।"

"যাচ্চলে। আজকেই তো ডাকাতি হয়েছে।"

"সেই দলে ও ছিল কি না জানি না।"

"তুই এদের নিয়ে কারবার করিস, না?"

"কারবার বলা যায় কি না বুঝতে পারছি না।"

অর্জুন শুনল অজিত ভাবছে, অর্জুন কোনও অ্যাডভেঞ্চারে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। ওর সঙ্গে থাকলে মন্দ হয় না। অর্জুন হাসল।

মন্ডলপাড়ায় চলে এলো। অর্জুন বলল, "বাঁ দিকে চল।"

একটাও প্রশ্ন না করে বাঁদিকের রাস্তা ধরল অজিত। একেবারে বৈদ্যনাথের বাড়ির সামনে পৌঁছে অর্জুন ওকে থামাল। বিশুনাথদের বাড়ির দরজা বন্ধ। সেখানে শব্দ করতে ভেতর থেকে হেঁড়ে গলার চিৎকার ভেসে এল, "কে?"

"আমি অর্জুন।"

দরজা খুললেন বৈদ্যনাথ। সম্ভবত হেলমেট থাকায় তিনি চিনতে পারলেন না, "কি চাই?"

"বিশুনাথ বাড়িতে আছে?" হেলমেট খুলল অর্জুন।

"ও। তুমি? তুমি আবার এসেছ? তোমার সাহস তো কম নয়।"

"আপন কি ভয়ঙ্কর মানুষ, যে আসতে ভয় পাব?" অর্জুন হাসল।

"তোমরা আমার ছেলেকে মিথ্যে মামলায় জড়িয়েছ। ওর জীবনটাকে নষ্ট করে দিতে চাইছ তোমরা।" গলা তুলে চিৎকার শুরু করলেন বৈদ্যনাথ।

সামনের পথ দিয়ে যাঁরা যাচ্ছিলেন তাঁরা ওই চিৎকারে দাঁড়িয়ে গেলেন। ক্রমশ ভিড় বাড়তে লাগল। অজিত ডাকল, "অর্জুন, চলে আয়।"

অর্জুন হাত তুলল, "আপনি একটু থামবেন?"

"থামব? তুমি আমার ছেলেকে জেলে ঢোকাতে চাইছ বিনা দোষে, আর আমি চুপ করে থাকব। আগের দিন হলে তোমাকে আমি এই গ্রাম থেকে বেরোতে দিতাম না।"

"বেশ, আপনার আগের দিন এখন যখন নেই তখন দয়া করে বলুন বিশুনাথ বাড়িতে আছে কি না, কারণ আজ সকালেও ট্রেনে ডাকাতি হয়েছে। ও বাড়িতে থাকলে বেঁচে যাবে।"

এই সময় এক পৌঢ় এগিয়ে এসে বললেন, "বলে দাও না বিশু বাড়িতে আছে কি না? ট্রেন ডাকাতির কথা আমিও শুনেছি।"

"ও একটু বেরিয়েছে।" গম্ভীর মুখে বললেন বৈদ্যনাথ।

"কখন বেরিয়েছে?"

"সকালে।"

"ঠিক সময়টা বলুন।"

"এই তো একটু আগে।"

"কোথায় গিয়েছে? শিলিগুড়িতে?"

"আমি জানি না, আমাকে বলে যায়নি।"

"অনেক ধন্যবাদ।" অর্জুন ফিরে গেল বাইকে। সঙ্গে সঙ্গে বাইক চালু করল অজিত। জনতা কোনও আপত্তি জানাল না তাদের পথ করে দিতে।

হাইওয়েতে ওঠার পর অজিত বলল, "ভাগ্যিস লোকগুলো খেপে যায়নি। তা হলে ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারতাম না।"

"ওরা খেপে যাবে কেন?" ওই ভদ্রলোক সম্পর্কে গ্রামের কেউ ভাল ধারণা রাখেন না। উল্টে সবাই একটু বিরক্ত।"

"কিন্তু কেসটা কী বল তো? এই ছোকরাও ট্রেনডাকাতির সঙ্গে জড়িয়ে নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে পুলিশ ওদের ধরছে না কেন? পুলিশ জানে?"

"ধরেছিল কাল কোর্ট থেকে জামিন পেয়েছে।"

"জামিন পেয়েই আবার ডাকাতি করেছে।"

"সেটা এখনও জানি না।"

ওরা শিলিগুড়িতে চলে এল। অর্জুন বলল, "তুই আমাকে এয়ারভিউ হোটেলের সামনে নামিয়ে দে।"

"এখানে তোর কতক্ষণ লাগবে?"

"বলতে পারছি না।"

"তুই তো জলপাইগুড়ি ফিরে যাবি?"

"বাঃ, যাব না কেন?"

"গুরু, কোনও অ্যাডভেঞ্চারে যাচ্ছিস নাকি?"

"না, না। স্রেফ বেড়াতে এলাম।"

"ঠিক আছে। আমি ঘন্টাদুয়েক বাদে এখান দিয়ে ফিরব। তোর কাজ হয়ে গেলে অপেক্ষা করিস।" অজিত চলে গেল। অর্জুন বুঝল অজিত তাকে বিশ্বাস করেনি। কে বেড়াতে এসেছে বলা সত্ত্বেও বলল কাজ শেষ হয়ে গেলে অপেক্ষা করতে। সম্ভবত ওর ইচ্ছে ছিল তার সঙ্গে থাকার। কিন্তু আদৌ কোনও অ্যাডভেঞ্চারের কথা যখন মাথায় নেই তখন ও বেচারাকে হতাশ করে লাভ কী? ও ওর কাজ করুক।

এয়ারভিউ হোটেলের পাশে একটা সুন্দর রেস্তরাঁ আছে। খিদে পেয়েছিল। অর্জুন সেখানে বসে মোগলাই পরোটা খেয়ে নিল। তারপর বাইরে আসতেই পেট্রল পাম্পের সামনে মারুতি স্ট্যান্ডটা নজরে পড়ল। তার মনে পড়ল এই স্ট্যান্ডেই নাকি

মনাভাইকে পাওয়া যায় বলেছিল হারাধন। সে ধীরেসুস্থে পার হতেই শুনতে পেল, "আরে দাদা, আপনি?"

অর্জুন দেখল, মাধব এগিয়ে আসছে। মালবাজারের ঠোঁটকাটা চাঁদুর বন্ধু মাধু। গতকালই ওর সঙ্গে জলপাইগুড়িতে দেখা হয়েছিল। অর্জুন হাসল, "এই একটু কাজে এসেছিলাম। তুমি এখানে কী করছ?"

"এই স্ট্যান্ডেই তো আমি গাড়ি রাখি। কোথায় যাবেন বলুন।?"

"কোনও বিশেষ জায়গায় যাওয়ার কথা নয় আমার।" বলতে বলতে অর্জুনের খেয়াল হল। মাধুর কাছে মানাভাইয়ের খবর পাওয়া যেতে পারে।

"চলুন দাদা, আপনাকে চা খাওয়াই।"

"না, না। আমি এইমাত্র খেলাম। তুমি এখন কোথাকার প্যাসেঞ্জার তুলছ?"

"কোনও ঠিক নেই। পুরো ভাড়া পেলে প্যাসেঞ্জার যেখানে বলবে। তা না হলে কার্শিয়াং পর্যন্ত শাটল খাটব।" মাধব বলল।

"আচ্ছা, এখানে মানাভাই বলে কেউ আসে?"

মাধব চকিতে স্ট্যান্ডটা দেখে নিল, "কি ব্যাপার দাদা?"

"নামটা শুনে তুমি যেন চমকে উঠলে?"

"না, মানে, মানাভাই খুব পাওয়ারফুল লোক। এই স্ট্যান্ড ওই কন্ট্রোল করে। ওকে কমিশন দিতে হয় আমাদের।"

"তারপর?"

"কোনও বড় প্যাসেঞ্জার তুললে মানাভাইকে রিপোর্ট দিতে হয়।"

"কীরকম?"

"স্টেশনে নিয়ে গেলে কোন ট্রেনে যাচ্ছে, কীরকম দামি জিনিস নিয়ে যাচ্ছে, তার একটা আন্দাজ করে বলতে হয়।"

"সেটা শুনে মানাভাই কী করে?"

"তা আমি জানি না দাদা। ওই যে আসছে। ওই মারুতিটায়।"

অর্জুন দেখল একটা মারুতি ভ্যান বেশ জোরে ছুটে এসে কায়দা করে ওদের পেছনে পৌঁছেই সজোরে ব্রেক চাপল। চাকায় শব্দ হল। ড্রাইভারের পাশের আসন থেকে যে লোকটা নেমে দাঁড়াল তাকে দেখে মোটেই শক্তিমান বলে মনে হয় না। রোগা, খাটো, পরনে সাফারি। একবার মাধবকে দেখে লোকটা পাম্পের অফিসে ঢুকে গেল।

এই সময় ওপাশ থেকে একজন চিৎকার করল, "এ্যাই মাধু, কার্শিয়াং তুলবি? চারজন আছে।"

মাধব হাত নাড়ল, "পেছনে বসিয়ে দে। দাদা, কার্শিয়াং যাবেন?"

"না। আচ্ছা, এই মানাভাই থাকে কোথায়?"

''জানি না। তবে আমি ওঁকে কয়েকদিন পাঙ্খাবাড়ি পৌঁছে দিয়েছে। মানাভাইকে কেউ প্রশ্ন করে না।''

''ও এত শক্তিশালী হল কী করে? ওর মাথার ওপর কেউ আছে?''

''তা জানি না। তবে পুলিশ ওকে খুব খাতির করে।'' মাধব বলল।

এই সময় মানাভাই বেরিয়ে এল। অর্জুন লোকটাকে দেখল। ছোট ছোট পা ফেলে এগিয়ে আসছে। কাছে এসে বলল, ''এ মানাভাই, কার্শিয়াং যাচ্ছ?''

মাধব মাথা নাড়ল।

''এই প্যাকেটটা গুরুং-এর দোকানে দিয়ে দেবে।''

''ও যদি দোকানে না থাকে?''

''ওর বাপ থাকবে।''

''আচ্ছা।''

ওপাশ থেকে লোকটা চেঁচাল, ''পাঁচজন হয়ে গেছে।''

মাধব উত্তর দিল, ''আর একটা তোল।''

মানাভাই জিজ্ঞেস করল, ''ইনি যাবেন না?''

অর্জুন ঝটপট বলল, ''এখনও ঠিক করিনি।''

''তার মানে? আপনি যাবেন কি না ঠিক না করে স্ট্যান্ডে এসেছেন?''

''তা নয়। একবার ভাবছি যাব আর একবার ভাবছি গিয়ে যদি কাজ না হয় তাহলে ভাড়াটাই পকেটে থেকে যাবে।'' অর্জুন হাসল।

''আমার তো মনে হয় না। মাধব এতক্ষণ ধরে আপনার সঙ্গে কথা বলছে যখন তখন বোঝাই যাচ্ছে ও ভাড়া নেবে না। কী মাধব?''

মাধব হেসে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

''ও না নিলে ওর ক্ষতি হবে। সেটা কি ঠিক? তা ছাড়া ফেরার সময় তো ভাড়া দিতে হবে। কাজকর্ম নেই, বেকার ছেলে, তাই ঝুঁকি নিতে ঠিক সাহস হচ্ছে না।'' অর্জুন নরম গলায় বলল।

''কার্শিয়াং-এ কোথায় কাজ আপনার? আমাকে ওখানকার সবাই চেনে। আমাকে বললে আপনার উপকার হতে পারে।'' মানাভাই তাকাল।

অর্জুন দ্রুত নাম হাতড়াচ্ছিল। এর আগে কার্শিয়াং-এ সে গিয়েছে। সে বলল, ''ডাউহিল স্কুলে খাতাপত্র সাপ্লাই দেওয়ার জন্যে যাচ্ছিলাম।''

''ও। তাতে কি প্রফিট হবে আপনার?''

''ওঁরা যদি কাজটা দেন তা হলে কিছুটা উপকার হবে।''

''ঠিক আছে। ওখানে মিসেস তামাং আছেন। বলবেন, আপনি আমাকে চেনেন। হয়তো কাজ হয়ে যাবে। কী নাম আপনার?''

সে জবাব দেওয়ার আগে মাধব বলল, ''অর্জুন।''

মানাভাই মাথা নাড়তেই ওপাশ থেকে লোকটা চেঁচাল, "ছ" জল হয়ে গেছে জলদি। কার্শিয়াং, কার্শিয়াং।"

মাধব বলল, "যাঃ। চলুন, একজন প্যাসেঞ্জারকে নেমে যেতে বলি।"

মানাভাই মাথা নাড়াল, "না। তা পারো না তুমি। স্ট্যান্ডের নিয়ম হল প্যাসেঞ্জারকে গাড়িতে তুললে নামানো যাবে না। তুমি চলে যাও, আমি অর্জুনকে পরের গাড়িতে তুলে দেব।"

কথাগুলো শেষ হতেই টেলিফোন বেজে উঠল। মানাভাই পকেট থেকে মোবাইল বের করে নিচু গলায় 'হ্যালো' বলল। দু-তিনটে কথা বলেই লোকটা দ্রুত চলে গেল তার মারুতির দিকে। চোখের নিমেষে মারুতি হাওয়া হয়ে গেল।

মাধব হাসল, "এরকম মাঝে মাঝে হয়।"

"কীরকম?"

"ওই যে দেখলেন না! কেউ মোবাইলে ডেকে পাঠালে মানাভাই এখানে এক মুহূর্তে দাঁড়ায় না। আসুন।" মাধব হাঁটা শুরু করল।

"এই যে বললেন ডাউহিল স্কুলে যাবেন?"

"না। থাক। তা ছাড়া তোমার গাড়িতে জায়গা নেই।"

"আপনি আসুন না-!"

গাড়ির কাছে গিয়ে মাধব একটি নেপালি ছেলেকে নেপালি ভাষায় বলল সে যদি পেছনে গিয়ে বসে তা হলে আর একজন প্যাসেঞ্জার নিতে পারে।

ছেলেটা প্রবলভাবে আপত্তি করল। অর্জুন বলল, "মাধব, পরে আর একদিন হবে। এখন তুমি যাও।" বলে আর না দাঁড়িয়ে সোজা হাঁটতে লাগল। সেবক রোডে সে মারুতিটাকে দেখতে পেল। মানাভাইয়ের গাড়ি। একই নম্বর গাড়িতে কেউ নেই। উলটোদিকের বাড়িগুলোর দিকে নজর বোলাতেই চায়ের অফিসের সাইনবোর্ড দেখতে পেল সে। অর্জুন একটু সরে একটা দোকানের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। মানাভাই তা হলে এই ডেরায় এসেছে। কী এমন জরুরি ফোন, যা ওকে এখানে নিয়ে এল?

মিনিট তিনেক বাদে চারজন যুবক বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এল। রাস্তায় নেমে দু'পাশে দেখে ওরা চারজন দু'ভাগে দু'দিকে হাঁটা শুরু করল। অর্জুন এগোল। যারা শহরের দিকে যাচ্ছিল তাদের পেছনে চলে এল সে। একজন বলল, "আমি এখান থেকে রিকশা নিয়ে সিন ক্লেয়ারের সামনে চলে যাচ্ছি। তুমি পাঁচ মিনিট পরে অটো নিয়ে চলে এসো। এই রিকশা।" ছেলেটি একটা রিকশা দাঁড় করিয়ে উঠে বসল। দ্বিতীয় ছেলেটি ঘড়ি দেখল। অর্জুন তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই শুনতে পেল, "ব্যাটাকে ঠিক মেরে ফেলবে। বেইমানির শাস্তি মৃত্যু।"

অর্জুন গম্ভীর গলায় বলল, "এটা পৃথিবীর সব দেশের মাফিয়াদের নিয়ম। বেইমানির শাস্তি মৃত্যু।"

ভূত দেখার মতো চমকে উঠল ছেলেটা। তারপর মুখ ঘুরিয়ে পাঁই পাঁই করে ছুটতে লাগল শিলিগুড়ির ব্যস্ত রাস্তার পাশ ধরে। অর্জুনও দৌড়ল। এবং এই সময় যে চিৎকারে খুব কাজ হয় সেই চিৎকারটা করল সে, "চোর, চোর, ধরুন ধরুন।" দু'পাশের লোকজন অবাক হয়ে এই দৌড় দেখছিল, চিৎকার কানে যাওয়ামাত্র ছেলেটি যাদের পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল তাদের দু'জন ওকে জাপটে ধরল। ছাড়াবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করতে করতে ছেলেটি চেঁচাল, "আমি চোর নই, ছাড়ুন, ছেড়ে দিন আমাকে!"

ততক্ষণে অর্জুন পৌঁছে গেছে পাশে। ছেলেটির কবজি শক্ত করে ধরে জিজ্ঞেস করল, "তুমি চোর নও?"

"না।" মাথা নাড়াল ছেলেটি।

"তা হলে পালাচ্ছিলে কেন?"

"ছেড়ে দিন। ছেড়ে দিন প্লিজ।" সেইসঙ্গে অর্জুন শুনতে পেল, "এই লোকটা আমার মনের কথা টের পেল কী করে। আমাকে পালাতেই হবে। নইলে ওরা ঠিক মেরে ফেলবে। ধরা পড়ে গেছি জানলে বিশ্বাস করবে না।"

ভির জমাছিল। সবাই চোর দেখতে চায়। অর্জুন বলল, "শোনো, তোমাকে কেউ মারবে না। তুমি যদি আমার কথা শোনো তা হলে কোনও বিপদ হবে না।"

অর্জুন হাত বাড়িয়ে একটা রিকশা থামিয়ে ছেলেটাকে একটু জোর করেই সঙ্গে তুলে নিল। জনতা সম্ভবত হতাশ হল হাতের সুখ না করতে পারার জন্যে।

রিকশা চলছিল, অর্জুন ছেলেটার কবজি শক্ত করে ধরে জিজ্ঞেস করল, "নাম কী?"

ছেলেটা জবাব দিল না। অর্জুন বলল, "মুখ বন্ধ করে থাকলে কোনও লাভ হবে না। তুমি এমন ভাবছ আমি পুলিশ কি না, তাই তো?"

"আপনি কে?"

"আমি একজন সত্যসন্ধানী।"

"মানে?"

"ওটা তুমি বুঝবে না। তোমারা যেখান থেকে বের হলে সেখানেকি হারাধন আর বিশ্বনাথ ছিল? সত্যি কথা বলবে!"

"না।"

"ওরা কোথায়?"

"জানি না।"

"তুমি তখন কাকে মেরে ফেলার কথা ভাবছিলে? কে বেইমানি করেছে?"

"আমি আপনাকে কোনও কথা বলব না।"

"তুমি ভয় পাচ্ছ, ওরা তোমার ক্ষতি করবে?"

''যা সত্যি তাই আমাকে মানতে হবেই।''

''বাঃ! খুব ভাল। আজ ভোরে জলপাইগুড়ি রোডে টেন ডাকাতি করে যে জিনিসগুলো তোমরা পেয়েছ সেগুলো কোথায় রেখেছ?''

''আপনি, আপনি কী করে জানলেন?''

''সেটা তোমার না জানলেও চলবে। কত পেয়েছ আজকের কাজের জন্যে?''

''এখনও পাইনি। জিনিসগুলো বিক্রি হয়ে গেলে পাব।''

''তার মানে তুমি স্বীকার করছ-!''

''আপনি যখন সব খবর জানেন-!''

''তোমার নাম কী?''

''অসিত।''

''অসিত, এবার বলো হারাধন কোথায়?''

''সত্যি বলছি আমি জানি না।''

''মানাভাই কী বলল তোমাদের?''

অসিত তাকাল। বোঝা যাচ্ছিল সে খুব অবাক হয়ে গেছে। হঠাৎ গলার স্বর বদলে গেল ওর, ''আপনি আমাকে পুলিশে দেবেন না তো?''

''আপাতত না। অবশ্য তুমি যদি সহযোগিতা করো।''

''কী চান আপনি?''

''তোমাদের বসের কাছে যেতে চাই।''

''বসকে আমি কখনও দেখিনি।''

''কোথায় থাকেন তিনি?''

''তাও জানি না। যা কিছু খবর মানাভাই দেয়।''

''দ্যাখো অসিত, এখন পর্যন্ত তুমি সত্যি কথা বলছ বলেই মনে হচ্ছে। তোমার সঙ্গী সিনক্লেয়ার হোটেলের সামনে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে কেন?''

প্রশ্নটা করেই অর্জুন শুনতে পেল, ''অনেক বলেছি, আর বলা উচিত হবে না।''

''অর্জুন বলল, ''অনেক যখন বলতে বাধ্য হয়েছে তখন-।''

''আপনি কি ভগবান?'' কথা থামিয়ে দিল অসিত।

''সে কী?''

''না হলে আমি যা ভাবছি তা বুঝে ফেলছেন কী করে?''

''কেউ কেউ চিন্তা পড়তে পারে। শোনোনি?''

''বেশ। আমরা পাঞ্খাবাড়ি যাচ্ছি।''

''পাঞ্খাবাড়ির কোথায়?''

''জানি না, ওখানে গিয়ে গুরুংয়ের দোকানে দেখা করতে বলা হয়েছে।''

''তুমি কোথায় থাকো?''

প্রশ্নটা শুনে মুখ ফেরাল অসিত। অর্জুন বলল, "চুপ করে থেকে কোনও লাভ নেই। তুমি তো জানো আমি তোমার মনের কথা বুঝতে পারি।"

"ফাটাপুকুরে।"

"ঠিক আছে। তুমি গিয়ে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করো। আমি এখানে নামব।"

"আপনি আমার ক্ষতি করবেন না তো?"

"ক্ষতি করতে চাইলে তো প্রথমেই পাবলিককে দিয়ে মার খাওয়াতাম।" রিকশাওয়ালাকে থামতে বলে নেমে পড়ল অর্জুন। রাস্তার একপাশে তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাল। বেশ ভিড়। চিৎকার চেঁচামেচি লেগেই আছে। অর্জুন একটা এসটিডি বুথে ঢুকে পড়ল। একবারেই লাইন পেয়ে গেল সে. সুদর্শনই ফোন ধরলেন।

"আরে! আপনি কোথায়?"

"শিলিগুড়িতে। মানাভাইয়ের সন্ধান পেয়েছি।"

"বাঃ। কিন্তু শিলিগুড়ি তো আমার এলাকা নয়। এদিকে যে পাঁচজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তার চারজনই মারা গেছে। যে এখনও আছে সে কতক্ষণ থাকবে বলা যাচ্ছে না।"

"আমি এখন বসের সন্ধানে যাচ্ছি। হারাধন এবং বিশ্বনাথকে পাওয়া যাচ্ছে না। সম্ভবত ওদের জীবন বিপন্ন।" অর্জুন জানালো।

"আপনি এক কাজ করুন। শিলিগুড়ির কোন জায়গায় রয়েছেন এখন?"

"তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস।"

"দশ মিনিট অপেক্ষা করুন। শিলিগুড়ির ওসির সঙ্গে কথা বলছি। ওখানে থাপা আছে। খুব ভাল লোক। এসটিডি বুথের নাম কী?"

বাইরে বসা লোকটিকে জিজ্ঞেস করে নাম বলে দিল অর্জুন। বাইশ টাকা মিটারে উঠেছে। অর্জুন সেটা মিটিয়ে দিয়ে বলল, "একটু বসতে পারি ভাই?"

লোকটি বলল, "বসুন।"

চেয়ারে বসে রাস্তার দিকে তাকাল সে। লোকটা জিজ্ঞেস করল, "কোথাও যাওয়ার থাকলে বলুন টিকিট আনিয়ে দিচ্ছি।"

সে মাথা নাড়ল, "না কোথাও যাচ্ছি না। এই জায়গাটা সবসময় এমন জমজমাট থাকে? কত বাস যাচ্ছে আসছে!"

"সবসময়। সবরকম ধান্দা এখান থেকে হয়। আপনি কি আবার ফোন করবেন?"

"হ্যাঁ। দশমিনিট পরে।"

কিন্তু ন' মিনিটের মাথায় পুলিশের জিপটা সামনে এসে দাঁড়াল। মিষ্টি চেহারার এক ভদ্রলোক জিপ থেকে লাফিয়ে নামলেন। তাঁর পরনে জিনস আর হাওয়াই সার্ট। সোজা এসটিডি বুথে ঢুকে অর্জুনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "অর্জুন?"

অর্জুন উঠে দাঁড়াল, "মিস্টার থাপা?"

"ইয়েস আমাকে কে খবর দিয়েছে বলুন তো?"

"সুদর্শনবাবু।"

সঙ্গে সঙ্গে হাত মেলালেন ভদ্রলোক। ততক্ষনে পেছনের লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে হাত কচলাচ্ছে, "আসুন স্যার, আসুন স্যার। কোল্ড ড্রিঙ্ক না চা, কী বলব?"

হাত নেড়ে না বলে থাপা অর্জুনকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। চারপাশে তাকিয়ে বললেন, "জলপাইগুড়ির ওসি আমাকে রিকোয়েস্ট করেছেন আপনাকে সাহায্য করতে। আপনার কথা আমি আগেই শুনেছি, আলাপ করতে পেরে খুশি হলাম। এবার বলুন, কী ধরনের সাহায্য চাই।"

"আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন আজও ট্রেনে ডাকাতি হয়েছে এবং তিনজন যাত্রী ইতিমধ্যে মারা গিয়েছেন। আমার অনুমান ভুল হতে পারে কিন্তু ভুল না হলে ওই দলের পান্ডা এখন পাঙ্খাবাড়িতে আছেন।" অর্জুন বলল।

"পাঙ্খাবাড়ি? ওটা অবশ্য শিলিগুড়ি থানার মধ্যে পড়ে না, তবে আমার যেতে আপত্তি নেই। লেটস গো।"

যেতে যেতে প্রধান খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত ব্যাপার জেনে নিলেন। অর্জুন সব বলল, শুধু রুদ্রাক্ষের মালা প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেল। থাপা অবাক হয়ে বললেন, "বাঃ। আপনি তাহলে থটরিডার, আমি কি ভাবছি তা বলতে পারবেন?"

"চেষ্টা করব।"

অর্জুন সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেল, "ভারতবর্ষে এখনও জেমস বন্ড জন্মায়নি।"

থাপা জিজ্ঞেস করল, "বলুন তো, আমি কী ভাবলাম?"

অর্জুন বলল, ভারতবর্ষের কথা ভাবছেন কেন? পৃথিবীতেই কোনও জেমস বন্ড জন্মাবে না। কারণ ওর জন্ম উপন্যাসের পাতায়।"

প্রচন্ড জোরে হাত চেপে ধরে থাপা চেঁচিয়ে উঠলেন, "কী অদ্ভুত ব্যাপার। আপনি তো অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী।"

পেছনে বসা সেপাইরা মজা পেয়ে গেল। তারাও অর্জুনকে পরীক্ষা করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। দু'জনকে সন্তুষ্ট করে অর্জুন অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। জিপ শিলিগুড়ি থেকে বেরিয়ে কয়েক কিলোমিটার যাওয়ার পর দার্জিলিং-এর রাস্তা ছেড়ে বাঁ দিকে ঢুকে পড়েছিল। এবার আবার ডান দিকে বাঁক নিয়ে পাহাড়ের দিকে ছুটছে। সকলে চুপ করে গেলে অর্জুন অসিতের কথা নিয়ে ভাবতে লাগল। ছেলেটা থাকে ফাটাপুকুরে। এই জায়গাটাও শিলিগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ি যেতে পড়ে। একটা অদ্ভুত ঘটনা হল, এখন পর্যন্ত এই দলের যে তিনজনের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তারা থাকে শিলিগুড়ির বাইরে। অর্থাৎ এই দলের ছেলেগুলোকে ওরা শহরের বাইরে থেকে কি সংগ্রহ করে? কেন করে? এই ছেলেরা মফস্বলের বলে শহরের ছেলের মত চালাকচতুর নয় বলে কি

ওদের ধারণা? এবং অবশ্যই এরা বেকার, কাজকর্ম নেই টাকার লোভ দেখানো অনেক সহজ।

মানাভাইয়ের কথা ভাবল সে। লোকটাকে ধরা সহজ। কিন্তু ওকে ধরে যে কিছুতেই পেট থেকে কথা বের করা যাবে না এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত। ওর ওপর আস্থা না থাকলে ওকে প্রকাশ্যে চলাফেরা করতে দেওয়া হত না। অর্জুনের মনে পড়ল মানাভাই মারুতিভ্যানের ড্রাইভার মাধবকে একটা প্যাকেট দিয়েছে পাঙ্খাবাড়িতে পৌঁছে দিতে। সে উত্তেজিত হল। মাধবকে প্যাকেটটা গুরুংয়ের দোকানে পৌঁছে দিতে বলেছিল মানাভাই। সেই গুরুংয়ের দোকানেই যাচ্ছে অসিত। এই গুরুং লোকটা খুব জরুরি। মাধব যখন জিজ্ঞেস করেছিল গুরুং না থাকলে কী করবে, তখন মানাভাই জবাব দিয়েছিল, ওর বাপ থাকবে। কথাদুটোর মানে, এক, গুরুং তার দোকান ছেড়ে কোথাও যায় না। দুই, যে যখন কোথাও যায় তখন তার বাবা দোকান চালায়।

জিপ পাহাড়ে উঠেছিল। পাঙ্খাবাড়ির পথ অনেকটা খাড়াই। এই পথ আগে আরও খারাপ ছিল। কার্শিয়াং যাওয়ার মূল রাস্তা সুখনা দিয়ে। একটু ঘুরপথ বলে সময় লাগে। এখন পাঙ্খাবাড়ির পথ অনেকটা ভাল। ভারী বাস বা লরির এই পথে যেতে অসুবিধে হয়। কিন্তু জিপ বা মারুতি এই পথে সহজেই চলে যায় এবং কম সময়ে কার্শিয়াং পৌঁছায়। ফলে এই পথে গাড়ির সংখ্যা প্রচুর বেড়ে গিয়েছে। অর্জুন দেখল সোজা ওপরে উঠে আচমকা ডান দিকে বাঁক নিতে হল জিপটাকে। শক্ত করে কিছু ধরে না রাখলে মুশকিল। মিস্টার থাপা জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি পাঙ্খাবাড়িতে আগে গিয়েছেন?"

"না।" অর্জুন মাথা নাড়ল।

"তা হলে প্রথমে এখানকার পুলিশ স্টেশনে যাওয়া উচিত।"

"আমার মনে হয় সেটা না করাই ঠিক হবে।"

"কেন?"

"আমি এখনও জানি না ওদের চিফ পাঙ্খাবাড়িতে আছে কিনা। যদি থাকে এবং এটাই যদি ওর আস্তানা হয় তা হলে লোক্যাল থানার সঙ্গে ভাল সম্পর্ক থাকাই স্বাভাবিক। সেটা না থাকলেও থানায় ওর বিশ্বস্ত কেউ থাকতে পারে, যে আমাদের আসার খবরটা ওকে পৌঁছে দেবে।"

"আপনি দেখছি খুব সতর্ক।" মিস্টার থাপা বললেন।

অর্জুন হাসল, "তা ছাড়া যদি চিফ এখানে না থাকে তা হলে আমি হাসির খোরাক হয়ে যাব। আপনিও হয়তো সময় নষ্ট করার জন্যে বিরক্ত হবেন। কিন্তু আপনি তো নিজেই এসেছেন সাহায্য করতে।"

"হুম। তা হলে আমরা কোথায় যাচ্ছি? পাঙ্খাবাড়ি এসে গেল বলে।"

অর্জুন একটু ভাবল। বাঁক ঘুরতে দূরে কিছু বাড়ি দেখা গেল পাহাড়ের গায়ে। অর্জুন বলল, "জিপ থামাতে বলুন, আমরা দু'জন এখানে নেমে পড়ি।"

জিপ থামালেন মিস্টার থাপা, "তারপর?"

"ওরা জিপ নিয়ে পাঙ্খাবাড়ি ছাড়িয়ে কিছুটা ওপরে উঠে দাঁড়াক। জিপ শিলিগুড়ির দিকে মুখ ঘুরিয়ে এমন ভান করুক যে . এঞ্জিনে গোলমাল হয়েছে। ঠিক আধঘন্টা বাদে আবার ওরা পাঙ্খাবাড়ির ভেতর দিয়ে নীচে নেমে এসে এখানে অপেক্ষা করবে। যদি আমাদের দেখা না পায় তা হলে আধঘন্টা আরও অপেক্ষা করে পাঙ্খাবাড়িতে গিয়ে গুরুংয়ের দোকানের খোঁজ করে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে। ওদের বুঝিয়ে দিন।" অর্জুন ধীরে ধীরে বলল। মিস্টার থাপা তার সেপাইদের কী করতে হবে বুঝিয়ে ড্রাইভারকে গাড়ি ছাড়তে বলে অর্জুনের সঙ্গে নীচে নেমে দাঁড়ালেন। একটু বাদে জিপ চোখের আড়ালে চলে গেলে মিস্টার থাপা জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে তো কোনও মানুষের বাড়ি নেই, এখানে নামলেন কেন?"

"একটা মিনিবাস আসছে, চলুন ওটায় উঠি।"

"বাসে?"

"হ্যাঁ। আপনাকে যদি কেউ পুলিশ বলে চিনতে না পারে তা হলে আমাদের যাত্রী ছাড়া অন্য কিছু ভাববে না। আপনার সঙ্গে অস্ত্র আছে?"

মিনিবাস আসছে বাগডোগরা থেকে। বেশ ভিড়। কোনও মতে দু'জনে সিঁড়ির ওপর পা রাখতে পারলেন। যাত্রীরা সবাই পাহাড়ের মানুষ। পাঙ্খাবাড়িতে নেমে মাথা পিছু দু'টাকা দিতে হল। মিস্টার থাপার আপত্তি সত্ত্বেও অর্জুনই দিয়ে দিল। পাঙ্খাবাড়ির বাসস্ট্যান্ড আদৌ জমজমাট নয়। পাহাড়ি জায়গার বাসস্ট্যান্ডেই যা কিছু প্রাণচাঞ্চল্য থাকে। এখানে একটা চায়ের দোকান, একটা রেস্টুরেন্ট আর কিছু অন্যদিনের দোকান নজরে পড়ল। এদের মধ্যে কোনটা গুরুং-এর দোকান? অর্জুন ঘড়ি দেখল। অসিত এবং তার বন্ধুর এখানে চলে আসার কথা। ওরা নিশ্চয়ই গুরুং-এর দোকানে পৌঁছে গেছে।

"চা খাবেন?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"না। আমি চা খাই না।"

"সিগারেট?"

হাত নাড়লেন ভদ্রলোক, "আপনি খেলে খেতে পারেন।"

"আসলে স্থানীয় লোকের সঙ্গে কথা বলতে গেলে চায়ের দোকানে ঢোকা দরকার। চলুন।" ওরা দোকানটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

"একটা চা।" অর্জুন বলল।

একজন পৌঢ়া দোকান চালাচ্ছেন। গরম জলে কাপ ধুতে ধুতে জিজ্ঞেস করলেন, "স্পেশাল, না অর্ডিনারি।"

"স্পেশ্যাল।"

প্রৌঢ়া খুশি হলেন, "এখানে কোথায় এসেছেন আপনারা?"

"কোথাও না। কার্শিয়াং যাচ্ছিলাম, জায়গাটা দেখে ভাল লাগল বলে নেমে পড়লাম। একটু ঘুরে আবার বাস ধরব।"

চায়ের কাপ অর্জুনের হাতে তুলে দিয় প্রৌঢ়া নেপালি ভাষায় মিস্টার থাপাকে জিজ্ঞেনস করলেন, "আপনিও আগে এখানে অসেননি?"

মিস্টার থাপা জবাব দিলেন, "আমি তো এদিকে থাকি না।"

"ও। এখানে দেখার কিছুই নেই। থাকতে হয় বলে থাকি।"

মিস্টার থাপা জিজ্ঞেস করলেন, "খুব ঠান্ডা পড়ে শীতকালে?"

"খুব মানে দার্জিলিংয়ের মতো নয়।"

"আমাকে এক বন্ধু বলেছিল পাঙ্খাবাড়িতে থাকার জায়গা পাওয়া খুব মুশকিল। কার যেন দোকান আছে তিনি ইচ্ছে করলে ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। আর, নামটা মনে পড়ছে না!" মিস্টার থাপা অভিনয় করলেন।

"কোন দোকান? এভারেস্ট স্টোর্স? প্রধানের দোকান?"

"না, না। পেটে আসছে, মনে আসছে না।"

"গুরুং-এর দোকান?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। গুরুং। এই নামটাই শুনেছিলাম।"

"গুরুং, আর আগের মতো নেই। ওর হালচাল সব বদলে গেছে। আগে ও একটা ঘর ভাড়া দিত। তখন রোজগার ছিল না। এখন পাহাড়ের ওপাশে জমি কিনে বিরাট বাড়ি করেছে। পাঁচিল ঘেরা।"

"হঠাৎ বড়লোক হয়ে গেল?"

"ওর দাদা এল কাঠমন্ডু থেকে। অনেক টাকা নিয়ে এসেছে।"

মিস্টার থাপা বলল, "একেই বলে কপাল। গুরুং ভাইয়ের দোকানটা কোথায়?"

"একটু ওপরে উঠলেই বাঁ দিকে দেখতে পাবেন।"

চায়ের দাম একটু বেশি। হাসিমুখে সেটা মিটিয়ে দিয়ে ওরা হাঁটা শুরু করল। মিস্টার থাপা বললেন, "একটু রহস্যের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু গুরুংকে কী বলবেন?"

"আগে গিয়ে দেখি কী অবস্থা, সেই বুঝে কথা বলা যাবে।"

অর্জুন বলল। বাঁক ঘুরতেই ডান দিকে একটা ডাল-ভাত-রুটির হোটেল আর বাঁ দিকে একটা বড় স্টেশনারি দোকান দেখতে পেল ওরা। দোকানের নাম, কাঞ্চনজঙ্ঘা।

মিস্টার থাপা বললেন, "এরকম নির্জন জায়গায় এত বড় দোকান!"

"নিশ্চয়ই খদ্দের আছে।"

"একটা বুড়ো বসে আছে দোকানে।"

"উনি সম্ভবত গুরুং-এর বাবা।"

"কী করে বুঝলেন?"

"চলুন না, জিজ্ঞেস করে দেখা যাক।"

এখন এখানে ঠান্ডা নেই, তবু বৃদ্ধ সোয়েটার পরে বসে আছেন কাউন্টারের ওপারে। চকোলেট থেকে হরলিকস, খাতাপত্র, প্রসাধনী জিনিসের বিপুল সম্ভার এখানে সাজানো। বৃদ্ধ রোগা। পিটপিটে চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী চাই?"

"আচ্ছা, এখানে মিস্টার গুরুংকে পাওয়া যাবে?"

"আমিই গুরুং।"

"ও। নমস্কার। আমরা আপনার সাহায্য চাই। কলকাতার একটা স্কুলের তিরশটা বাচ্চা নিয়ে স্কাউটের দল এখানে আসবে। ওরা এই পাঙ্খাবাড়িতে সাতদিন থাকতে চায়। যা খরচ লাগে সব দেবে। আমরা তার ব্যবস্থা করতে এসেছি। বাসস্ট্যান্ডে খোঁজ করতে সবাই বলল আপনার দোকানে আসতে। আপনি এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন।" অর্জুন বলল।

"আমি কী করে সাহায্য করব!"

"কিছু না, ওই তিরিশজনের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা যদি করে দেন। তিরিশজনের জন্যে দিনে তিন হাজার টাকার বাজেট আছে।"

বৃদ্ধকে চিন্তিত দেখাল, "সাতদিন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আপনি তো পাহাড়ের লোক, আপনিও এর সঙ্গে আছেন?"

প্রশ্নটা মিস্টার থাপার দিকে তাকিয়ে, অতএব তাঁকে জবাব দিতে হল, "আমি শিলিগুড়িতে থাকি। ইনি আমার পরিচিত।"

"দেখুন, এখানে অত লোকের থাকার জায়গা নেই। তবে, আমার ছেলের সঙ্গে কথা বললে ও একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারে।"

"বেশ তো। তিনি এখন কোথায়?" মিস্টার থাপা জিজ্ঞেস করলেন।

"ওই বেঞ্চিতে বসুন। তার আসার সময় হয়ে গিয়েছে।"

দোকানের সামনে ফেলে রাখা বেঞ্চিতে বসল ওরা। অর্জুন লক্ষ্য করল বৃদ্ধ ওদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। এই বুড়ো যেভাবে আমিই গুরুং বলেছিল, তাতে অবাক হয়েছিল সে। ওর ধারণা ছিল গুরুং লোকটা মধ্যবয়সী। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর ওরা দেখতে পেল মিস্টার থাপার জিপ ওপর থেকে নেমে আসছে। অর্জুনের ভয় হল অফিসারকে দেখে ড্রাইভার জিপ না থামিয়ে দেয়। সে মিস্টার থাপাকে বলল, "আসুন, দোকানের ভেতরে যাই। খিদে পেয়েছে, বিস্কুট কিনব।"

মিস্টার থাপা ইঙ্গিত বুঝতে পেরে চটপট দোকানের ভেতর ঢুকে পড়তেই জিপ পাশের রাস্তা দিয়ে নেমে গেল।

"কি বিস্কুট নেবেন?" বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন।

"মেরি বিস্কুট।"

বৃদ্ধ একটা প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, "ওই যে এসে গেছে।"

ওরা দেখল বেশ স্মার্ট এক নেপালি ভদ্রলোক দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। বৃদ্ধ প্রথমে তাঁর ভাষায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন। শোনার পর গুরুং জিজ্ঞেস করল, "কলকাতার কোন স্কুল?"

"ক্যালকাটা ইউনাইটেড।" ঝটপট নামটা বানাল অর্জুন।

"কবে আসতে চায়?"

"সামনের মাসের প্রথম সপ্তাহে।"

"দেখুন ভাই, এখানে তো থাকার জায়গার খুব অভাব। আপনারা বলেছেন তিনশটা বাচ্চা আসবে, সঙ্গে নিশ্চয়ই মাস্টাররাও ক'জন থাকবে?"

"হ্যাঁ, তা তো থাকবেই।"

"অসম্ভব।"

"আপনিও সমস্যাটাকে অসম্ভব বলছেন?"

"আমি কে?" গুরুং হাসল, "আপনারা কার্শিয়াং চলে যান, ওখানে অনেক জায়গা পেয়ে যাবেন।"

"না, ওরা কার্শিয়াং বা কোনও শহরে থাবতে চায় না।"

"আরে ভাই, এই পাহাড়ে কে আপনাকে দশ-বারোটা ঘর দেবে? তাঁবুতে থাকবে ওরা?" আচমকা জিজ্ঞেস করল গুরুং।

"কোনও সমস্যা নেই।"

"তা হলে আরও এক হাজার ডেইলি বেশি দেবেন।"

"কোথায় তাঁবু ফেলব?"

"ওই পাহাড়ের পেছনে আমার বাড়ি আছে। তার পাশে অনেকটা জায়গা প্লেন করে রেখেছি, ওখানে ফেলা যেতে পারে।"গুরুং কথাটা বলতেই ওর বাবা বললেন, "জায়গাটা দেখিয়ে দাও না!"

"তুমি সব ব্যাপারে কথা বলবে না।"

"ও।"

এই সময় দুটো ছেলে এগিয়ে এল, "মিস্টার গুরুং আছেন?"

"হ্যাঁ। আপনারা?"

"আমরা শিলিগুড়ি থেকে আসছি।"

"আমিই গুরুং কে পাঠিয়েছি?"

"এম বি"

অর্জুনের খেয়াল হল, এই দুজনকে সেবক রোডে দেখেছে সে। অসিতদের সঙ্গে বেরিয়ে এরাই উল্টোদিকে হেঁটে গেছে। অর্জুন গুরুং-এর পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই শুনতে পেল ঝামেলা হয়ে গেল। এই দুটোকে বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে।"

অর্জুন বলল, "আপনি তো বাড়িতেই যাবেন, আমরা জায়গাটা দেখে আসি আপনার সঙ্গে গিয়ে।"

গুরুং মাথা নাড়ল, তারপর ইশারায় ওদের অনুসরণ করতে বলে হাঁটতে লাগল। অর্জুন শুনল, "মাত্র আটাশ হাজার, খুব বেশি হলে সাতদিনে চোদ্দ হাজার থাকবে। বাবার জন্যে ফালতু ঝামেলা নিতে হবে।"

অর্জুন বলল, "গুরুংভাই এখানে টাকাটা বেশি কথা নয়। আপনি যে বাচ্চাদের সাহায্য করছেন এটা ক'জন করে বলুন!"

অর্জুন শুনল, "এ ব্যাটা আমাকে জ্ঞান দিচ্ছে। কিন্তু ওর সঙ্গীটাকে খুব চেনা চেনা লাগছে। "কোথায় দেখেছি যেন!"

গুরুং দাঁড়াল, "আপনি কোথায় থাকেন ভাই?"

অর্জুন বলল, "গ্যাংটকে। আপনি নিশ্চয়ই গ্যাংটকে গিয়েছেন?"

অর্জুন শুনল, "গ্যাংটকের জুবিলি স্কুলে পড়ায় নাকি লোকটা?"

"গ্যাংটকে কয়েকবার গিয়েছি। গ্যাংটকের কোথায়?"

মিস্টার থাপা কোনও কথা বলার আগেই অর্জুন বলল, "উনি টিচার। গ্যাংটকের জুবিলি স্কুলে পড়ান।"

গুরুং-এর মুখে হাসি ফুটল, "তুই বলুন। আপনাকে ওখানেই দেখেছি। খুব চেনা মনে হচ্ছিল। আমার ভাগনি ওই স্কুলে পড়ে।"

মিস্টার থাপার গলা শুকনো শোনাল, "কী নাম?"

"শ্রেয়া নীচু ক্লাসে পড়ে।"

পিচের রাস্তা ছেড়ে কাঁচা পথ ধরে ওরা অনেকটা চলে এসেছিল। এবার বাঁক ঘুরতেই বাড়িটা দেখতে পেল। অনেকটা জায়গা সমতল করে দোতলা বাড়ি বানানো হয়েছে। বাড়িটা বিশাল। লম্বা তারের বেড়ায় ঘেরা বাগানে ফুলের গাছ আছে। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনার বাড়ি?"

"ঠিক আমার নয়, আবার আমারও বলতে পারেন।"

"বুঝলাম না।"

"বাড়িটা বানিয়েছেন আমার দাদা। উনি বিয়ে করেননি। তাই ওঁর পরে তো আমিই পাব।" হাত বাড়াল গুরুং, "ওই যে ওপাশে যে জায়গাটা দেখছেন, ওখানে তাবু ফেলা যেতে পারে।"

"জলের ব্যবস্থা?"

"ওসব হয়ে যাবে।"

মিস্টার থাপা বললেন, "সত্যিই বাড়িটা সুন্দর। একবার ভেতরে গিয়ে দেখতে পারি যদি আপনার আপত্তি না থাকে।"

অর্জুন শুনল, "ঝামেলা পাকাল। ঠিক আছে, বাগানে নিয়ে গিয়ে বের করে দেব। হাজার হোক শ্রেয়ার মাষ্টার। অর্জুন লক্ষ্য করছিল সেই ছেলে খানিকটা দুরত্ব রেখে ওদের অনুসরন করছে। এম বি পাঠিয়েছে মানে কি মানাভাই পাঠিয়েছে? ওরা কি লোকটাকে এম বি বলে?

নীচে নেমে গেটের কাছে পৌছাতেই একটি পাঞ্জাবি যুবক দৌড়ে এসে তালা খুলে দিল। ছেলেটি স্বাস্থ্যবান। বাড়ির সামনে বাগানে পৌছে গুরং বলল, "এই হল বাড়ি। এমন কিছু আহামারি নয়।"

অর্জুন বলল, "তা হলে তাবুর ব্যাপারটা পাকা।"

"এখনই বলতে পারছি না। সামনের মাসে আমার বাইরে যাওয়ার কথা আছে। যদি ক্যানসেল হয় তা হলে করে দেব।"

"কিন্তু সেটা জানব কী করে?"

"দোকানের ঠিকানায় চিঠি লিখবেন।"

এই সময় মিস্টার থাপা বললেন, "এক্সকিউজ মি, মিস্টার গুরুং। আমি আপনাদের টয়লেটটা ব্যবহার করতে পারি? স্টমাকে মনে হচ্ছে গোলমাল হয়েছে।"

অর্জুন শুনল, "সর্বনাশ! টয়লেটে যাওয়ার আর সময় পেল না।"

সে বলল, "এ কী বলছেন মিস্টার গুরুং! জন্মমৃত্যু এবং টয়লেট পাওয়া তো আগে থেকে জানান দিয়ে হয় না।" গুরুং এমনভাবে ঘুরে দাঁড়াল যেন কেউ তাকে সপাটে চড় মেরেছে। তার মুখ হাঁ হয়ে গেল। অর্জুন বলল, "ওঁকে টয়লেটটা দেখিয়ে দিন।"

"আপনি! আপনি হঠাৎ এ-কথা বললেন কেন?"

"আমার মনে হল আপনি এরকম ভাবতে পারেন।"

গুরুং তাকিয়ে ছিল একদৃষ্টিতে। অর্জুন শুনতে পেল, "এই লোকটা থেকে দূরে থাকতে হবে। খুব সাঙ্ঘাতিক লোক। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে মিস্টার থাপাকে বললেন, "আসুন আমার সঙ্গে। আর তোমরা ওই গাড়িতে গিয়ে উঠে বোসো।"

বাগানের আর-এক প্রান্তে দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। তার সামনে দুজন ড্রাইভার। মিস্টার থাপাকে নিয়ে গুরুং বাড়ির ভেতর ঢুকে গেলে ছেলে দুটো এগিয়ে গেল গাড়ির দিকে। ড্রাইভার ওদের মারুতি ভ্যানে উঠতে বলল। অর্জুন ভেবে পাচ্ছিল না কীভাবে বাড়ির দোতলায় উঠবে। ছেলে দুটোকে যখন গাড়িতে উঠতে বলা হয় তখন নিশ্চয়ই কোথাও নিয়ে যাওয়া হবে। তা হলে হারাধনদের কি এ-বাড়িতে নিয়ে আসা হয়নি? অসিত এবং তার সঙ্গীকোথায় গেল? এদের চিফ যদি দোতলায় থাকে তা হলে

সেখানেই কি ওরা রয়েছে। সেই শক্তিমান লোকটি এখন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। ওপরে যেতে গেলে ও নিশ্চয়ই বাধা দেবে এবং তাতে কাজের কাজ হবে না। লোকটার কাছাকাছি গিয়ে কানপাতল অর্জুন, কিন্তু কিছুই শুনতে পেল না। আশ্চর্য! লোকটা কি কিছুই ভাবছে না?

মিস্টার থাপাকে নিয়ে গুরুং ফিরে এল একটু বাদে, "আচ্ছা!"

অর্জুন শুনতে পেল, "বিদায় হও।"

"তা হলে আপনি কথা দিচ্ছেন না?"

মাথা নাড়ল গুরুং। অর্জুন শুনল, "এখানেই একে আনাই ভুল হয়েছে। একটু পরেই বস বের হবে। এদের এখান থেকে না কাটালে-!"

গুরুং হাত নাড়ল, "বাই।"

অর্জুন মিস্টার থাপাকে বলল, "চলুন, অন্য কোথাও খোঁজ করি।"

ওরা গেট পেরিয়ে পাহাড়ি পথ ধরে হেঁটে ওপরে চলে এল। বাড়িটা এখন নীচে। অর্জুন চারপাশে তাকিয়েএকটা ঝোপ দেখতে পেল। সে পা চালাল। "চটপট চলে আসুন, লুকোতে হবে।"

মিস্টার থাপা একটুও দ্বিধা করলেন না। ঝোপের আড়ালে চলে গিয়ে বললেন, "জানি না, কেউ আমাদের লক্ষকরল কি না।"

"নীচের ওরা করেনি, ওপর থেকে কেউ করলে ওরা জানতে পারবে না। ভেতরটা কীরকম দেখলেন?"

"কিছুই চোখে পড়েনি। তবে এত কস্টলি টয়লেট বোধ হয় ফাইভ স্টার হোটেলেই থাকে। এরকম জায়গায় ভাবা যায় না। আপনার যদি মনে হয় এই বাড়িতে লিডার লুকিয়ে আছে তা হলে আমারা সার্চ করতে পারি।"

"আমি তো নিশ্চিত নই।"

"কিন্তু এই গুরুং লোকটা হঠাৎ যেন বদলে গেল।" মিস্টার থাপার কথা শেষ হওয়ামাত্র একটা লোক বাইরে বেরিয়ে ইশারা করা মাত্র ভ্যানের পাশে দাঁড়ানো মারুতি জেনটা ধীরে ধীরে এগিয়ে এল সিঁড়ির সামনে। তারপরই সেই শক্তিমান লোকটা পেছনের দরজা খুলে একপাশে দাঁড়িয়ে গেল। এখান থেকে বারান্দাটা দেখাযাচ্ছে, কিন্তু বাইনোকুলারের অভাব টের পাচ্ছিল অর্জুন।

এই সময় চারজন লোক বেরিয়ে এল ব্যস্তপায়ে। এদের মধ্যে গুরুংও আছে। ওদের পেছন পেছন যে মানুষটা বেরিয়ে এল তার উচ্চতা বড়জোর সাড়ে চার ফুট। মাথাটা বিশাল বড়। পরনে গ্যালিস দেওয়াপ্যান্ট-শার্ট। গরমজামা পরেনি। লোকটা সোজা গাড়ির মধ্যে ঢুকে যাওয়ামাত্র ওরা দরজা বন্ধ করে ভ্যানের দিকে ছুটল। শুধু গুরুং গিয়ে জেনের সামনের সিটে বসে দরজা বন্ধ করল।

অর্জুন বলল, "তাড়াতাড়ি চলুন। বড় রাস্তায় পৌঁছতে হবে।

মিস্টার থাপা বললেন, " সেটা সম্ভব করতে পারলে চাকরি ছেড়ে দিতাম। ওরা গাড়িতে চেপেএখানে আসার আগে বড় রাস্তায় পৌঁছলে বিশ্বরেকর্ড হয়ে যাবে দৌড়নোর।" কথাটায় যুক্তি আছে। তা ছাড়া গুরুং মিস্টার থাপাকে চিনতে পারেনি বটে, কিন্তু ওই বেঁটে লোকটা তো চিনতে পারে। গাড়ি দুটো তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। ঝোপের মধ্যে বসেই ওরা দেখল গাড়ি দুটো ওদের পেছন দিয়ে ওপরে উঠে গেল।

মিস্টার থাপা ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, "ওরা কোথায় গেল এইটেই জানা গেল না।"

"ওরা তো আমাদের ঠিকানাটা বলত না!"

"এই যে ছেলে দুটো এল, ওরাও কি ডাকাতি করে?"

"সেটাই স্বাভাবিক।"

বড় রাস্তায় পৌঁছতেই ভ্যানটা আচমকা থেমে গেল পাশে, "এ

কী! দাদা, আপনি?"

"আরে! তোমার এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল?"

"তাড়াতাড়ি? এর মধ্যে ঘন্টা চারেক চলে গেছে জানেন?"

মাধব কার্শিয়াং থেকে প্যাসেঞ্জার নিয়ে ফিরছে। ভ্যান ভর্তি। "মাধব, তুমি একটু নেমে আসতে পারবে?"

"নিশ্চয়ই।" গাড়ি একপাশে করে প্যাসেঞ্জারদের কিছু বুঝিয়ে সে চলে এল অর্জুনের কাছে। নিচু গলায় বলল, "বড়বাবুকে নিয়ে এখানে?"

"চিনতে পেরেছ?"

"চিনব না? আমার কথা একটু বলে দেবেন যাতে কেস না নেয়?"

" বলে দেব। কিন্তু তোমার কাছে একটা উপকার চাই।"

"আদেশ করুন।"

"তুমি আজ গুরুং-এর দোকানে একটা প্যাকেট পৌঁছে দিয়েছ মনে আছে? মানাভাই তোমাকে দিয়েছিল!"

"আর বলবেন না দাদা। শিলিগুড়ি থেকে ওঠার সময় পেছনে বসা একটা প্যাসেঞ্জার এমন ঝামেলা করছিল যে, যাওয়ার সময় ওই প্যাকেটটা দিতে একদম ভুলে গিয়েছি। এখন দেব।"

"প্যাকেটটা দেখতে পারি?"

মাধব গাড়ির দিকে ছুটে গেল। ফিরে এল একটা বড় খাম হাতে। অর্জুন বলেছিল, "মানাভাই বলেছিল প্যাকেট, এটা তো খাম।"

"এটাই দিয়েছিল দাদা।"

অর্জুন ঝটপট খাম খুলে ফেলল। গোটাপাঁচেক কাগজ। ইংরেজিতে ছাপা কোনও কিছুর জেরক্স। পড়ে বিষয় জানার সময় হাতে নেই, দ্রুত পাতা উলটে গেল সে। পেছনের পাতার কোণে লেখা, টু থার্টি পি এম, সিংলা বাংলো।

এই কথাটার মানে কি? সে মাধবকে জিজ্ঞেস করল, "সিংলা বাংলো বলে কোনও বাড়ি কি এখানে আছে?"

"না দাদা, আমি জানি না।"

"দোকানে গুরুং-এর বাবা আছেন। ওকে যখন এই খামটা দিতে যাবে তখন জিজ্ঞেস করবে সিংলা কোথায়?"

"ঠিক আছে। কিন্তু খামটা তো ছিঁড়ে ফেলেছ?"

"বলবে ছিঁড়ে গিয়েছে।"

মাথা নেড়ে চলে গেল মাধব তার গাড়ি নিয়ে।

মিস্টার থাপা বললেন, "খবরটা দিতে ওকে আবার ফিরে আসতে হবে। তার চেয়ে চলুন এগিয়ে যাই।"

ওরা হাঁটছিল। একটু এগোতেই মিস্টার থাপার ভ্যানটাকে দেখতে পাওয়া গেল। ওপর থেকে ধীরে ধীরে নামছে। অর্জুন বলল, "উঠে পড়ুন। রাস্তায় মাধবকে ধরে নেব।"

।।৫।।

ভ্যানের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল মাধব। ঠিক গুরুং-এর দোকানের সামনেই সে ভ্যানটাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। এতক্ষণ আটকে থাকায় ভ্যানের যাত্রীরা এবার চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করেছে। জিপটাকে পাশে আনতেই মাধব এগিয়ে এল, "আধ কিলোমিটার নেমে বাঁ দিকের বাঁচা রাস্তা ধরে গেলে সিংলা পড়বে! এবার আমি যাই দাদা?"

"ঠিক আছে। খামটা ছেঁড়া দেখে কিছু বলেনি?"

"আমার হাত থেকে নিয়ে টেবিলে রেখে দিল বুড়ো। ভাল করে দেখল না পর্যন্ত। চলি।" দ্রুত ভ্যানে উঠে নেমে গেল মাধব।

ঘড়ি দেখল অর্জুন। আড়াইটে বেজে গেছে। এইসব পাহাড়ে দিন শেষ হয় খুব তাড়াতাড়ি। সে ড্রাইভারকে একটু জোরে চালাতে অনুরোধ করল। পুলিশের ড্রাইভারকে এরকম অনুরোধ করলে কী হয় তা হাড়ে হাড়ে টের পেল অর্জুন। ঝড়ের বেগে গাড়ি ছুটছিল, এই গাছটা সামনে চলে আসছে, এই সরে যাচ্ছে। আধ কিলোমিটার পথ ফুড়ুত করে ফুরিয়ে যেতেই অর্জুন চিৎকার করে বসল, "এবার বাঁ দিকের রাস্তা ধরে আস্তে চলুন।" মিস্টার থাপা বললেন, "জেরক্সের পেছনে ওই লেখাটা তো অন্য কোনও কারণেও লেখা হতে পারে। তাই না?"

"ঠিকই। কিন্তু আমাদের কাছে কোনও তথ্য নেই, ওরা কোথায় গেল তাও জানতে জানতে পারছি না। সিংলা বলে যখন একটা জায়গা আছে তখন তার বাংলোটা দেখে আসা যাক।" এই সময় পেছনে বসা একটি সেপাই জানাল, খানিকটা দূরে আর-একটা গাড়ি আসছে। এই রাস্তা পাকা নয়। বেশ সরু এবং পাহাড়ের গা ঘেঁষে চলেছে। দুটো বড় গাড়ি পাশাপাশি হলে অনেক জায়গায় আটকে যাবে। অর্জুন তেমন একটা জায়গায় পৌঁছে বলল, "এখানে দাঁড়িয়ে যান। পেছনের গাড়ির লোকদের একটু দেখুন মিস্টার থাপা।"

মিনিট খানেকের মধ্যে পেছন থেকে হর্ণের আওয়াজ ভেসে এল। খুব তাড়া থাকলে লোকে ওই ভাবে হর্ণ বাজায়।

অর্জুন বলল, "আমি নামব না। আপনারাই দেখুন।"

কিন্তু তার আগেই পেছনের গাড়ির আরোহী নেমে এসে বেশ কর্কশ গলায় গাড়ি সরাতে বলছে। একজন সেপাই জবাব দিল, "পুলিশের গাড়ি দেখছেন না?"

"পুলিশের গাড়ি বলে মাথা কিনে নিয়েছ নাকি? এটা পাহাড়, শিলিগুড়ি নয়। এই জিপ তো শিলিগুড়ির।"

মিস্টার থাপা নেমে দাঁড়ালেন। "হ্যাঁ শিলিগুড়ির।"

"ও, আপনি! এখানে আপনাকে দেখতে পাব ভাবিনি।"

"আপনি এখানে কি করছেন?"

"এই একটু পারিবারিক কাজে যাচ্ছিলাম।"

অর্জুন বুঝতে পারল গলাটা মানাভাইয়ের জিপের সামনের সিটে বসে থাকায় সে লোকটাকে দেখতে পাচ্ছিল না। কিন্তু লোকটা এখানে এসেছে যখন তখন নিশ্চয়ই দেরি করে এসেছে। জেরক্সের পেছনে লেখা ছিল আড়াইটে।

"স্যার। গাড়িটা একটু সরালে আমরা বেরিয়ে যেতে পারি।"

"আপনি তো সিংলা বাংলোয় যাচ্ছেন?"

"না, মানে, আপনি .. .. ..!"

"আপনার কোনও চিন্তা নেই আমরাও সেখানে যাচ্ছি।"

"না, না, আমি এক রিলেটিভের বাড়িতে যাচ্ছি।"

ইতিমধ্যে ড্রাইভার দু-তিনবার ইচ্ছে করে ফলস স্টার্ট দিচ্ছিল। শব্দ করে থেমে যাচ্ছিল এঞ্জিন। এবার অর্জুনের ইঙ্গিতে এঞ্জিন চালু করল। মিস্টার থাপা বললেন, "ওই যে, গাড়ি ঠিক হয়ে গেছে। এদিকটায় আমি কখনও আসিনি। আপনি আসুন না আমার সঙ্গে। আপনার রিলেটিভের বাড়িতে নামিয়ে দেব। আপনার ড্রাইভারকে বলুন ফলো করতে। আসুন।" জিপের পাশে পৌঁছে অর্জুনের দিকে অর্থবহ হাসি ছুড়ে মিস্টার থাপা ডাকলেন, "জলদি।" এবার অর্জুন মানাভাইকে দেখতে পেল। লোকটা যদি ভূত দেখত তা হলেও এত অবাক হত না। কিন্তু দ্রুত নিজেকে সামলে নিল সে,

অর্জুনের পাশে উঠে বসল গম্ভীর মুখে। এই জিপে ড্রাইভারের পাশে দু'জন স্বাভাবিক ভাবে বসতে পারে, তিনজন হওয়ায় মিস্টার থাপাকে একটু বেকায়দায় বসতে হয়েছিল। জিপ চলতে শুরু করলে মিস্টার থাপা বললেন, "সিংলা বাংলোটা কোথায় বলে দেবেন।"

অর্জুন শুনল, "এই লোকটা যে পুলিশের চর তা যদি আগে বুঝতাম! মধুভাই একে চেনে। ওর হচ্ছে! এরা সিংলা বাংলোর খবর পেল কী করে? ওখানে নিশ্চয়ই বস আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। গাড়িটা যদি রাস্তায় খারাপ না হত তা হলে অনেক আগে পৌঁছে যেতাম।"

অর্জুন হাসল শব্দ করে।

লোকটা রাগী চোখে তাকাল। অর্জুন শুনল, "এ ব্যাটা হাসছে কেন?"

অর্জুন বলল, "গাড়ির কথা কেউ বলতে পারে। কিন্তু কখন খারাপ হবে তা কেউ জানে না। আড়াইটের মধ্যে পৌঁছতে হলে আপনার উচিত ছিল অনেক আগে রওনা হওয়া। তাই না মানাভাই।"

"আপনি কে বলুন তো?"

"থটরিডার। আপনি যা ভাববেন আমি তা বলে দেব।"

"আমি এখন থেকে কিছুই ভাবব না।" অর্জুন শুনতে পেল।

সে হাসল, "তা কি হয়?" আজ সকালে ট্রেনে যে ডাকাতিটা হল তা নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না? হারাধন যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সেটা নিয়ে ভাববেন না?" হতভম্ব হয়ে গেল মানাভাই। অর্জুন শুনল, "এ ব্যাটা সব জেনে গেল কি করে?"

"জানতে ইচ্ছে করলে জানা যায়।" অর্জুন বলতেই মানাভাই চিৎকার করে উঠল, "আমি নেমে যাব। এই লোকটা যা ইচ্ছে আমার নামে বলছে।"

"মনে মনে আপনি ঠিক উল্টো ভাবছেন।"

মানাভাই মাথা নামাতেই অর্জুন মিস্টার থাপাকে বলল, "ও, ভাবছে কখনওই আমাদের সিংলা বাংলোতে নিয়ে যাবে না।"

"আমি মরে যাব, আমাকে মেরে ফেলবে।" আর্তনাদ করে উঠল লোকটা।

হঠাৎ মিস্টার থাপার গলার স্বর বদলে গেল, "না নিয়ে গেলে আমি আপনাকে মেরে ফেলব। অপরাধীদের মারতে আমার খুব ভাল লাগে।"

"স্যার, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি শিলিগুড়িতে ফিরে যাচ্ছি।"

অর্জুন মানাভাইয়ের হাঁটুতে হাত রাখল, "ওই বেঁটে লোকটার নাম কী?"

"কোন বেঁটে লোক?"

"যাকে রিপোর্ট করতে আজ আপনি এসেছেন।"

"আমি নাম জানি না। সবাই চিফ বলে, আমিও তাই বলি।"

"মিস্টার থাপা, এই লোকটা মিথ্যে কথা বলছে।"

"ঠিক আছে। ওর নাম এস কে গুরুং।"

"দোকানদার গুরুং-এর দাদা?"

"না। উনি নেপাল থেকে এসেছেন।"

"আপনার সঙ্গে আলাপ হল কি করে?"

"আমি কাজ খুঁজছিলাম, উনি কাজ দিয়েছেন।"

"এ-পর্যন্ত ক'টা ট্রেন ডাকাতি করেছেন?"

"আমি করিনি।"

"যারা করেছে তাদের রিক্রুট তো আপনি করেছেন।"

অর্জুন শুনল, "আর বলব না। অনেক বলে ফেলেছি।"

এই পথে মানুষ ছিল না এতক্ষণ। এবার এক বৃদ্ধকে দেখা গেল। মিস্টার থাপা জিপ থামিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "সিংলা কতদূরে?"

"আপনারা সিংলা পেরিয়ে এসেছেন।"

আচমকা খেপে গেলেন মিস্টার থাপা। জিপ থেকে মানাভাইকে প্রচন্ড জোরে ঘুষি মারলেন। মানাভাই মাটিতে পড়ে গিয়ে আর্তনাদ করতেই পেছনে আসা ভ্যানটা মুখ ঘোরাতে চেষ্টা করল। মানাভাই চিৎকার করে ড্রাইভারকে নিষেধ করতে সে থেমে গেল। মাটি থেকে উঠে মানাভাই বলল, "ঠিক আছে, যা বলবেন তাই করব।"

অর্জুন গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। ভ্যানের ড্রাইভারকে জিপে নিয়ে আসা হল। মানাভাইকে নিয়ে ওরা ভ্যানে উঠল। মিস্টার থাপা ড্রাইভিং সিটে বসলেন। দুটো গাড়ি মুখ ঘোরালো। জিপের ড্রাইভারকে বলা হল ইশারা করা মাত্র থেমে যেতে।

মিনিট দশেক যাওয়ার পর মানাভাই বলল, "এই জায়গার নাম সিংলা।"

অর্জুন বলল, "এবার আপনি সত্যি কথা বলছেন।"

"কি করে বুঝলেন?"

"কারণ উল্টোপাল্টা ভাবেননি। বাংলোটা কোথায়?"

"ডান দিকের রাস্তায়। বাঁক নিলেই দেখা যাবে।"

গাড়ি থামল। অর্জুন নেমে জিপের কাছে গেল। ভ্যানের ড্রাইভার গম্ভীর মুখে বসে ছিল। অর্জুন তাকে বলল, "তুমি ওই ভ্যান ভাড়া খাটাও।"

"হ্যাঁ। এসব ঝামেলা হবে জানলে কে আসত!"

"মাধবকে চেনো?"

"মাধব? আমার বন্ধু।"

"বাঃ। শোনো, যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, তা হলে জিপ থেকে নেমো না।" তারপর সেপাইদের দিকে তাকিয়ে অর্জুন বলল, "আপনারা এখানেই অপেক্ষা করুন। পনেরো মিনিটের মধ্যে না ফিরলে বাংলোর ভেতর যাবেন। সামনের বাঁক ঘুরলেই বাংলো।"

মিস্টার থাপা ধীরে-ধীরে গাড়িটাকে নীচে নামিয়ে আনলেন। তাঁর পাশের সিটে বসে আছে মানাভাই, পেছনের সিটে যতটা সম্ভব নিজেকে আড়াল করে রেখেছিল অর্জুন। বাঁক ঘুরতেই বাংলোটাকে দেখা গেল। কাঠের বাড়ি। দোতলা। সামনে লন। দোতলার বারান্দায় দু'জন লোক বসে আছে। তাদের একজন চিৎকার করে উঠে দাঁড়াল, "এতক্ষণে আসার সময় হল? চিফ তোমাকে কখন রিপোর্ট করতে বলেছিল?"

মানাভাই জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, "গাড়ি খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমার কিছু করার ছিল না।"

অর্জুন বুঝল, দোতলার লোকটা গুরুং। কিন্তু সে যদি ড্রাইভারকেদেখতে পায় তা হলে স্পষ্ট চিনে ফেলবে। ভাগ্যিস ভ্যানের ড্রাইভারের দিকটা বাংলোর উলটো দিকে পড়েছে। অর্জুন চাপা গলায় বলল, "আপনি নামবেন না। বলুন পায়ে চোট পেয়েছেন, হাঁটতে পারছেন না।"

"কী হল? নামছ না কেন?" গুরুং চিৎকার করল ওপর থেকে।

"হাঁটতে পারছি না। পায়ে চোট।"

গুরুং মুখ ঘুরিয়ে কিছু বলল। এবার বারান্দায় রেলিংয়ের ঠিক ওপরে দ্বিতীয় লোকটির মুখ দেখা গেল। সেই বেঁটে লোকটা। কোনও মানুষের মুখ যে এত কদর্য হতে পারে, তা ভাবা যায় না।

"কি করে চোট পেলে?" গুরুং জিজ্ঞেস করল।

"বললাম না গাড়ি খারাপ হয়ে গিয়েছিল অ্যাকসিডেন্টে, তখনই চোট পাই। ডাক্তার পর্যন্ত দেখাতে পারিনি।" মানাভাই জবাব দিল।

"চোট পেলে না নামাই ভাল। সেটা আরও খারাপ হবে।"

গমগম করল কণ্ঠস্বর। ওই বেঁটে মানুষের শরীর থেকে এত জোরে শব্দ বেরোতে পারে না শুনলে বিশ্বাস করা যাবে না। তারপর ধীরে ধীরে সিঁড়ির ওপর এসে দাঁড়াল লোকটা। বেঁটে, গালিস দেওয়া প্যান্ট, মাথায় টুপি এবং মুখে চুরুট। চোখে সরু ফ্রেমের চশমা। লোকটা বলল, "রিপোর্ট?"

"আজ আমাদের কেউ ধরা পড়েনি। তবে পাঁচজন প্যাসেঞ্জার উন্ডেড হয়েছে। ছেলেরা বাধ্য হয়েছে ওটা করতে।"

"ভুল। উন্ডেড নয়। চারজন মারা গেছে।"

"আমি খবর পাইনি সার।"

"তুমি আজকাল গাফিলতি করছ মানাভাই। আমি এখানে বসে যে খবর পাই, তুমি শিলিগুড়িতে থেকে তা পাও না। কত টাকার জিনিস?"

"এখনও কাউন্ট করিনি। আনুয়াবাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি।"

"এটাও ঠিক নয়। হিসেব তোমার রাখা দরকার। আজ মাত্র পঁচিশ হাজার এনেছে ছেলেরা। এত কম টাকার জন্যে চার্জ করা বোকামি। মালদা থেকে যে তোমাকে খবরটা দিয়েছে তাকে আর দরকার নেই।"

"ঠিক আছে।"

"গাড়িটা কার?"

"ভাড়া গাড়ি।"

"ড্রাইভার?"

"বিশ্বাসী।"

"এখন থেকে নিজে গাড়ি চালাবে। সাক্ষী সঙ্গে রেখে ঘোরা আমি পছন্দ করি না।" আরও দু'পা নেমে এল বেঁটে লোকটা, "গুরুং, ওদের আনো।"

একটু পরেই নীচের ঘরের দরজা খুলে ছ'জন ছেলেকে বাইরে বের করে আনা হল। ওদের সঙ্গে ছ'জন বলবান মানুষ ছিল। দু'জনের হাত পেছন দিক করে বাঁধা।

"ওদের আলাদা করে দাও।"

গুরুং নেমে এসেছিল নীচে। হারাধন আর বিশুনাথকে দল থেকে সরিয়ে একটা বিশাল গর্তের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। যে মাটি খুঁড়ে গর্ত করা হয়েছে সেই মাটি পাশেই স্তূপ করা। পেছনে হাত থাকায় ওদের অসহায় দেখাচ্ছিল।

"এই দুটো ছেলেকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছিল। কেন করেছিল? না, একজন যে ডাকাতি করেছে সেই প্রমাণ ট্রেনে রেখে এসেছিল। তার সূত্র ধরে ওর বাড়িতে সেই রাত্রে দু'জন হানা দিয়েছিল যারা পুলিশ নয়। খবরটা যদিও সে আমাদের কাছে ঠিক পৌঁছে দিয়েছিল কিন্তু লোকদু'জনকে ওদের ঠিকানায় পাওয়া যায়নি। অতএব সাক্ষী থেকেই গেল। পুলিশ ওকে পরদিন ধরল। ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় দ্বিতীয়জনকেও তুলে নিল। কিন্তু পুলিশ কী করল? এই দ্বিতীয়জনকে মারল না। বরং দু'জনকেই আদর করে সেদিনই জামিন দিয়ে দিল। কেন দিল? যেখানে পুলিশ ডাকাতের সন্ধানে মরিয়া সেখানে তাদের দু'জনকে হাতে পেয়েও কোনও কারণে ছেড়ে দিতে পারে? আমি এই প্রশ্নের জবাব ওই ছ'জনের কাছে জানতে চাইছি।"

বিশুনাথ মাথা নাড়াল, "আমি কিছু বলিনি। জলপাইগুড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর ওকেই পুলিশ বারংবার জেরা করেছে।"

"তাই। হা হা করে হাসল বেঁটে লোকটা। হাসি যেন তার থামতেই চায় না। "গুরুং শুনেছ? কী হে, তুমিও একই কথা বলবে নাকি?"

হারাধন মাথা নাড়াল, "হ্যাঁ। বুঝতে পারে।"

"অসম্ভব।" চিৎকার করে উঠল লোকটা, "একমাত্র মূর্খরাই এমন কথা বলতে পারে। এই বিজ্ঞানের যুগে এ-কথা শোনাও অন্যায়। নিজেদের দোষ ঢাকতে তোমরা গল্প শোনাচ্ছ।" বলতে বলতে লোকটা নেমে এল গাড়ির পাশে।

হারাধন চিৎকার করল, "আমি মিথ্যে কথা বলছি না।"

হঠাৎ অর্জুনের কানে এল, "এই দুটোকে এবার মাটির তলায় পাঠানো যাক। বাকি চারজন দৃশ্যটা দেখে সবাইকে বলবে বেইমানির শাস্তি কি!"

বিশ্বনাথ চেঁচাল, "মানাভাই, ওকে একটু বলুন, চুপ করে থাকবেন না।"

অর্জুন শুনল মানাভাইয়ের গলা, "পাগল।"

বেঁটে লোকটি দু'বার গালিস ধরে টানল। ফত ফত করে শব্দ বাজল। অর্জুন স্পষ্ট শুনতে পেল, "মানাভাই বাঁচবে? ওরঁও তো সময় হয়ে এসেছে!" তারপরেই চিৎকার শুনতে পেল, "গুরুং, রেডি ফর অ্যাকশন।"

সঙ্গে সঙ্গে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল অর্জুন। সে বসে ছিল দুটো সিটের মাঝখানে পা রাখার জায়গায়। একেবারে গাড়ির মধ্যে ঝুঁকে না দেখলে তাকে কেউ দেখতে পাবে না। তার শরীরের পাশেই ভ্যানের দরজা, দরজার ওপাশে বেঁটে লোকটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। অর্জুন শুনতে পেল বেঁটে লোকটা ভাবছে, "ওদের জ্যান্ত কবর দেওয়াই ভাল।"

সে সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল, "জ্যান্ত কবর দেওয়া ভাল কেন?"

বেঁটে লোকটা আপন মনে জবাব দিল, "ভাল, কারণ এতে কোনও খরচ নেই।

গুরুং-এর গলা কানে এল, "আপনি কার সঙ্গে কথা বলছেন?"

বেঁটে সজাগ হল, "মানে?"

"আপনি বললেন এতে কোনও খরচ নেই। কিসের খরচ বুঝলাম না?"

"তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছ জ্যান্ত কবর দেওয়া ভাল কেন?"

"না তো! আমি এই মাত্র এখানে এলাম।"

"তা হলে নিশ্চয়ই মানা জিজ্ঞেস করেছে।"

সঙ্গে সঙ্গে মানা প্রতিবাদ করল, "আমি? আমি জ্যান্ত কবরের কথা জানব কি করে যে জিজ্ঞেস করব?"

"তাই তো! এটা কি রকম ব্যাপার হল?"

"আপনি কি জ্যান্ত করব দেওয়ার কথা ভেবেছেন?"

"অ্যাঁ? হ্যাঁ। বোধ হয়।"

"তা হলে সেই থটরিডার এখানেও এসে গিয়েছে।" মানাভাই বলল।

"থটরিডার?" বেঁটে লোকটার গলা ফ্যাঁসফেসে শোনাল।

"ওই যে যার কথা ওই ছেলেগুলো এতক্ষণ বলছিল।"

"বাজে কথা। মনের ভুল। ওদের গর্তে ফেলে দাও। তোমরা যারা দৃশ্যটা দেখছ, তারা মনে রেখো, তোমাদের দেখানোর জন্যে এইখানে নিয়ে আসা হয়েছে। বেইমানির শাস্তি কি তা তোমরা নিজের চোখে দ্যাখো। এর পরে ফিরে গিয়ে তোমাদের অন্য সহকর্মীদের এই গল্প শোনাবে। তোমরা যতদিন বিশ্বস্ত থাকবে ততদিন তোমাদের

সমস্ত দায়িত্ব আমার। কিন্তু বেইমানি করলেই আমার চেয়ে নির্দয় পৃথিবীতে আর কাউকে পাবে না। তবে আমি এদের সুযোগ দিতে চাই। গুলি করে মেরে ফেলে না দিয়ে জ্যান্ত গর্তে ফেলব ওদের। ফেলে মাটি চাপা দিয়ে দেব। ওরা সুযোগ পাবে ওপরে উঠে আসার। যে নরম মাটি মাথার ওপর থাকবে তা সরিয়ে উঠে আসতে পারলেই বেঁচে যাবে।'' গালিস টানল লোকটা, ''গুরুং।''

গুরুং ইশারা করতেই বলবান লোকদুটো হারাধন এবং বিশ্বনাথকে গর্তে ফেলার জন্যে এগিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে পনেরো মিনিট সময় চলে গেছে। জিপের শব্দে অর্জুন বুঝল সেপাইরা চলে এসেছে। সে ঝট করে ভ্যানের দরজা খুলতেই বেঁটে লোকটা খুব অবাক হয়ে তাকাল। অর্জুন তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ভ্যানের ভেতর টেনে আনার চেষ্টা করল। সঙ্গে সঙ্গে সে মিস্টার থাপার চিৎকার শুনতে পেল। ড্রাইভারের সিট থেকে নেমে তিনি সতর্ক করছেন, ''যে যেখানে দাঁড়িয়ে আছো, সেখানেই থাকো, নড়বার চেষ্টা করলেই গুলি করব।''

ওই বেঁটে মানুষটার শরীরে এত শক্তি যে, অর্জুন ওকে কিছুতেই কাবু করতে পারছিল না। লোকটা তাকে খামচাচ্ছিল। পা ছুড়ছিল শূন্যে, আবার মাথা দিয়ে ওর পেটে আঘাত করছিল। সেপাইরা ছুটে এল জিপ থেকে। ওরা বেঁটে লোকটাকে টেনে সরাতে যেতেই ওর হাত এসে পড়ল অর্জুনের বুকে। সঙ্গে সঙ্গে গলায় এত জোরে টান লাগল যে, শ্বাস বন্ধ হওয়ার জোগাড়। অর্জুন মুখ ফেরাতেই শব্দ হল এবং ঝুরঝুর করে রুদ্রাক্ষের ফলগুলো ছড়িয়ে পড়তে লাগল মাটিতে।

ততক্ষণে লোকটাকে কবজা করে ফেলেছে সেপাইরা। অর্জুন নিচু হয়ে রুদ্রাক্ষ কুড়ানোর চেষ্টা করল। ওদিকে মিস্টার থাপা তখন গুরুংকে আটক করেছেন। কিন্তু বাকি চারটে ছেলে প্রাণপণে দৌড়োতে শুরু করেছে। সেপাইরা তাদের ধরার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল।

পরিস্থিতি আয়ত্তে আসার পর মিস্টার থাপা অর্জুনের দিকে এগিয়ে আসছিলেন। অর্জুন তখনও উবু হয়ে রুদ্রাক্ষ খুঁজে চলেছে। গোটা দশেক পাওয়া গিয়েছে এতক্ষণে। সে চিৎকার করল, ''এগোবেন না। পায়ের তলায় পড়লে নষ্ট হয়ে যাবে ওগুলো।''

''কি খুঁজছেন?''

''রুদ্রাক্ষ। এক মুঠোর প্রচুর দাম।''

মিস্টার থাপার সামনে একটা পড়ে ছিল। সেটা তুলে তিনি অর্জুনের দিকে ছুড়ে দিলেন। ওরা বাড়ির ভেতরটা সার্চ করতে গেল, এক এক করে প্রায় আঠারোটা রুদ্রাক্ষ পেল অর্জুন। এগুলো কি দিয়ে গাঁথা ছিল সেটা বোঝা যাচ্ছে না। কোনও সুতো নেই বা চেন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। হারাধন আর বিশ্বনাথ কাছে এসে দাঁড়াতে সে চিৎকার করল, ''খোঁজো, ভাল করে খুঁজে দ্যাখো তো এরকম রুদ্রাক্ষ পাও কি না।

হারাধন কান্না জড়ানো গলায় বলল, "দাদা, আমাদের কি হবে?"

অর্জুন মুখ ফিরিয়ে দেখল। হাত বাঁধা অবস্থাতেও বেঁটে লোকটা শরীর মুচড়ে যাচ্ছে সমানে। তার চোখ জ্বলছে।

অর্জুন বলল, "কি আর হবে? আবার ডাকাতি করবে।"

"না দাদা। জীবনে আর ওসব কাজ করব না।"

"সেটা পুলিশ বুঝবে। এখন পারো যদি খুঁজে বের করো।"

ইতিমধ্যে লোকাল থানায় খবর পাঠিয়েছেন মিস্টার থাপা। সেখান থেকে বিরাট পুলিশ বাহিনী এসে গেছে। একই সঙ্গে তল্লাশি চালানো হচ্ছে গুরুং-এর বিশাল বাড়িতে। গুরুং-এর মানাভাই পুলিশকে জানিয়েছে এই লোকটি নেপাল থেকে এসেছিল তিন বছর আগে। একটু একটু করে লোকটা টাকা ছড়িয়ে ওদের দলে টেনে নিয়েছে। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে আলিপুর দুয়ারের রেলপথ ডাকাতির পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা বলে দল অর্গানাইজ করিয়েছে। স্থানীয় ছেলে নেওয়ার কারণ ওরা ওই রেলপথ থেকে চট করে যে যার বাড়িতে গিয়ে লুকোতে পারবে। এদিকে শিলিগুড়ি থেকে আনুয়াবাড়ি পর্যন্ত বাস রাস্তায় ডাকাতির পরিকল্পনা এই লোকেরই। ওরা এর নাম জানে না। ওকে চিফ বলে ডাকতে হয়।

তল্লাশি তখনও শেষ হয়নি, অর্জুন মিস্টার থাপাকে বলল, "এদের নিয়ে কি করবেন? এদের তো কোর্ট জামিন দিয়েছে।"

"তা হলে আমাদের কিছু করার নেই। কিন্তু যে চারজন পালিয়েছে তাদের ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে। ডাকাতির কিছু জিনিস এখানে পেয়েছি। গুরুংয়ের বাড়িতে কী পাওয়া যাবে জানি না।" মিস্টার থাপা বললেন।

"আমি এবার ফিরে যেতে চাই।"

"বেশ তো। যদি সম্ভব হয় কাল একবার আমার থানায় আসবেন।"

"চেষ্টা করব।"

মানাভাই পুলিশ হেফাজতে বলে ওর ভ্যানটাকে পাওয়া গেল। পুলিশ তাকে ছেড়ে দিয়েছে বলে ড্রাইভার খুব কৃতজ্ঞ। অর্জুনের সঙ্গে মারাধন এবং বিশ্বনাথ ভ্যানে উঠে বসল।

কিছুক্ষণ যাওয়ার পর হঠাৎ বিশ্বনাথ জিজ্ঞেস করল, "দাদা কিছু বলছেন না যে!"

"কি ব্যাপারে!"

"এখনই আমি একটা উল্টোপাল্টা ভেবে ফেলেছিলাম।"

"কি ভেবেছ?"

"বাঃ, আপনি তো সব বুঝতে পারেন। আমি ভাবছিলাম আপনি না থাকলে এতক্ষণে মাটির তলায় শুয়ে থাকতাম।"

অর্জুন চোখ বন্ধ করল। সে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। রুদ্রাক্ষগুলো এখন তার পকেটে। বাড়ি গিয়ে মালা গেঁথে গলায় পরলে তবে হয়তো এটা সক্রিয় হবে। এই শয়তানটা যে মালা আঁকড়ে ধরবে তা সে বুঝতে পারেনি।

ভ্যানের ড্রাইভার জলপাইগুড়িতে যখন পৌঁছে দিল তখন রাত ন'টা। পথে মন্ডলপাড়ায় বিশুনাথ এবং রেলগেটে হারাধন নেমে গিয়েছিল।

বাড়িতে না গিয়ে সোজা ঘোষপাড়া কালীবাড়ির কাছে দেবাশিসের সোনার দোকানে চলে এল অর্জুন। দেবাশিস তখন দোকান বন্ধ করছে। ওকে দেখে অবাক হল, "কি ব্যাপার? অর্জুন, তুই?"

"যাঃ, দোকান বন্ধ হয়ে গেছে?"

"বলো না, কী করতে হবে?"

"একটা মালা, রুদ্রাক্ষের, গেঁথে দিতে হবে।"

দেবাশিস মজা পেল। আলোর সামনে রুদ্রাক্ষগুলো ধরে বলল, "এগুলো কোথায় পেলে? একমুখী রুদ্রাক্ষ। বেশ দামি। কী দিয়ে গাঁথব?

"কি দিয়ে গাঁথলে ভাল হয়?"

"এগুলো তো সুতোয় গাঁথা হয়। লাল সুতো। দাঁড়াও।" অনেকক্ষণ ধরে একটা একটা করে রুদ্রাক্ষ বসিয়ে মালা গেঁথে ফেলল দেবাশিস। ওটা হাতে নিয়ে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কত দিতে হবে?"

"ধুস। এর জন্যে কেউ পয়সা নেয়! দামি জিনিস, যদি বিক্রি করার ইচ্ছে হয় তো বলবে।" দেবাশিস বলল।

মালাটা গলায় পরতেই অর্জুন বুঝল একটু ছোট হয়ে গেছে। তার মনে কয়েকটা ফল সে খুঁজে পায়নি। সে চোখ বন্ধ করল কিন্তু কোনও শব্দ শুনতে পেল না। অথচ দেবাশিসের মনে কোনও ভাবনা আসছে না এমন তো হতে পারে না।

অর্জুন। জিজ্ঞেস করল, "তুমি কিছু ভাবছ?"

দেবাশিস মাথা নাড়াল, "ভাবছি এই জিনিস কোথায় পেলে?"

অর্জুন বেরিয়ে এল। রাত সাড়ে ন'টায় জলপাইগুড়ির রাস্তা ফাঁকা। ওর বুকের মধ্যে তখন প্রচন্ড চাপ। এ কি হল? মালাটা অকেজো হয়ে গেল? অমল সোমকে সে কি জবাব দেবে? আর অমল সোমকে না পেলে এই রহস্যের সমাধানও হবে না। কিন্তু তিনি কবে ফিরবেন তা তিনিই জানেন।

ততদিন এই মৃত রুদ্রাক্ষ আগলে বসে থাকতে হবে তাকে।

সমাপ্ত